## Unit–IV

# অবক্ষয় যুগে বাঙালির কবি টপ্পা, আখড়াই, হাফ-আখড়াই, খেউর গানের চর্চা ও তার সামাজিক ফলশ্রুতি : বাঙালির সংস্কৃতির ইতিহাস

### ✪ ভূমিকা ✪

**প্রাক্-আধুনিক শিল্পরুচি ঃ সমাজ প্রসঙ্গ**

আঠারো শতকে নদীয়ার পাড়ায় পাড়ায় গড়ে ওঠা আখড়াগুলিতে যখন কৃষ্ণলীলার কীর্তনাংগ গান প্রধান সংস্কৃতি চর্চা হিসাবে ঐ অঞ্চলে প্রসারিত হয় বাংলার সংস্কৃতি জগতে তখনো প্রধানত মঙ্গলকাব্যের যুগ। চতুর্দশ শতাব্দী থেকে শুরু হয়ে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যের রচনার ধারা অব্যাহত ছিল, কেননা এইসব কাব্যের গান লোকআসরে গাওয়ার রীতি ছিল এবং তা জনপ্রিয়ও ছিল। অবশ্য কয়েক শতাব্দী ধরে এদের অনুষ্ঠান ধর্মীয় রীতির অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। জনপ্রিয় ছিল বলা এই কারণে যে কয়েক শতাব্দী ধরে নতুন নতুন কবি বিভিন্ন আখ্যায়িকা নিয়ে মঙ্গলকাব্য কিংবা একই আখ্যায়িকা নিয়ে বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য রচনা করে এসেছেন। একমাত্র মনসামঙ্গলকাব্যই বাইশ জন কবির সংকলনে ধারাবাহিক আখ্যায়িকার গাওয়া হোত বলে উল্লেখ আছে— বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কবি এ সব রচনা করেছেন।

লোক আসরে মঙ্গলকাব্য গাওয়ার রীতি গড়ে ওঠে হিন্দু ধর্মাচরণ অঞ্চলভেদে, পালা পার্বণে বিভিন্ন ঋতুতে দেবদেবীর পুজো ও অন্যান্য ধর্মাচরণের মাহাত্ম্য প্রচারে। এইসব অনুষ্ঠানের জনপ্রিয়তা কতটা ধর্মের টানে, কতটা সংস্কৃতিচর্চার টানে আজ তা বলা মুস্কিল। তবে এটুকু বলা যায়, ধর্মের মাহাত্ম্য অটুট রাখতে নানা আখ্যায়িকা গড়ে তুলে বা লোকশ্রুতিকে ভিত্তি করে এ-সব রচিত হয়েছে। সামন্ততন্ত্রের স্বার্থে ধর্মের ব্যবহার সে যুগে অবশ্যম্ভাবী ছিল, সংস্কৃতির বিষয়বস্তু, সংস্কৃতিচর্চার রীতি পদ্ধতি ধর্মের অনুশাসন মেনেই চলতো।

আনুষ্ঠানিক চর্চা হিসাবে মঙ্গলকাব্যগুলির মূল ধারায় তিনটি প্রধান কাব্যের কাহিনী ও গান বাংলার জনপ্রিয়তা পেয়েছিল, চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল। এগুলো ছাড়াও আরও কিছু অপ্রধান মঙ্গলকাব্য একই রীতি ও ধারাকে অনুকরণ করে রচিত হয়েছে, যেমন— কালিকামঙ্গল, শীতলামঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, শারদামঙ্গল, শিবমঙ্গল বা শিবায়ন, রায়মঙ্গল, সূর্যমঙ্গল, দুর্গামঙ্গল, কপিলামঙ্গল। এ ধরনের অজস্র মঙ্গলকাব্য আঞ্চলিক দেবদেবীর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী রচিত হয়েছে। বৈষ্ণব গীতিধারার পাশাপাশি শাক্ত সংস্কৃতির উপজীব্য হিসেবেই এগুলির সৃষ্টি। শক্তি ও বৈষ্ণব দু-ধারাই বাংলার সংস্কৃতি জীবন গড়ে তুলেছে।

বৈষ্ণবীয় গীতিচর্চার মূল নায়কেরা আখড়াবাসী ধর্মীয় গোষ্ঠী। এদের গানের অনুষ্ঠান আপামর জনসাধারণকেই টানতো। এ-ক্ষেত্রে শুধু গানের রসাবেশের আকর্ষণ কতটা লোকপ্রিয় বা ধর্মাচরণের অত্যাবশ্যকতাই জনচিত্তে কতখানি প্রবল তাও ভেবে দেখতে হয়। কয়েক শতাব্দী ধরে একই ধারার পুনরাবৃত্তি এবং প্রবহমানতা সংস্কৃতিচর্চার পুরানো বেড়া ভাঙতে পারেনি। কৃষ্ণবৈষ্ণব গানে একই রীতিতে রাধা, কৃষ্ণ আর কুব্জার বিরহ মিলন প্রসঙ্গ আর মঙ্গলকাব্যগুলিতে দেবদেবীর রীতিবদ্ধ প্রচার— এই ছিল বঙ্গীয় সংস্কৃতিচর্চার কয়েক শতাব্দীব্যাপী প্রবহমান ধারা।

প্রতিটি মঙ্গলকাব্যেই ধর্মের এক ভীতিজনক দিক দেখানো হয়েছে। দেবতা মানুষের পূজো পাবার জন্য লালায়িত। এদের কাহিনীতে দেবদেবীর আচার-আচরণ অতি সাধারণ মানুষের মতোই। মানুষের মতো তাদের রাগ, দ্বেষ, ঘৃণা, কান্না, স্নেহ, ঈর্ষা সবকিছুই রয়েছে। এমনকি মানুষের মতোই মন আকর্ষণের জন্যে স্বর্গের দেবীকে যৌনাকর্ষক সাজে আবির্ভূত হতে হয়। সব ক'টি মঙ্গলকাব্যই গাওয়া হোত ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ধর্মের পালনীয় রীতি অনুযায়ী। ফলে বিশেষজ্ঞদের মতে এই কাব্যগুলিতে সাধারণত "শিল্পগত দাবী অপেক্ষা সমাজের দাবী মিটাইবার দায়িত্ব অধিক" এবং কাহিনী বিন্যাসে "শিল্পগুণ বিসর্জন দিয়ে আচারের মুখ রক্ষা" ছিল বড়ো কথা, কারণ সমস্ত মঙ্গলকাব্যই হল ধর্মীয় উদ্দেশ্যপ্রণোদিত রচনা।

মনসামঙ্গল যেমন আষাঢ়ে সংক্রান্তির দিন ঘরে মনসার ঘট বসিয়ে সেইদিন গান শুরু হোত, শেষ হোত শ্রাবণ সংক্রান্তির দিন যেদিন হয় ঘটের বিসর্জন। একমাস ধরে অংশে অংশে ভাগ করে এই গান গাওয়ার অনুষ্ঠানে শেষ করা হোত। ধর্মমঙ্গল বারো দিনে গাইতে হোত, চণ্ডীমঙ্গল আট দিনে। পাঁচালীর সুরে এগুলি গাওয়া হোত বলে এদের বলা হোত বিশেষ বিশেষ দেবতার পাঁচালী। রীতিবদ্ধভাবে এই সব গান কয়েক শতাব্দী ধরে বাংলার জনচিত্তের সংস্কৃতি পিপাসা মেটাবার চেষ্টা করেছে। অনেকটা আধুনিক যুগের উপন্যাসের কাহিনীচিত্রের ঢংএ ঘটনার পর ঘটনা সাজিয়ে মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবী মাহাত্ম্য প্রচার করেছে।

ধর্মের অলৌকিক মহিমায় আচ্ছাদিত সামন্ততান্ত্রিক সমাজ কাঠামোয় স্থাপিত দেবদেবীর মাহাত্ম্য, তাদের রাগ, দ্বেষ, ঘৃণা, কান্না, ঈর্ষা ও বেদনার কাহিনী আর, অতি মানবিক প্রেমবিরহ কল্পনায় বৈষ্ণবীয় গানে ব্যক্তিগত চিত্তস্ফূর্তির সুযোগ সমাজমানসকে সুস্থিত রাখার চেষ্টা করেছে। এই সঙ্গে অবশ্য রামায়ণ, মহাভারত, পৌরাণিক কাহিনী বা মঙ্গলকাব্য প্রণোদিত পাঁচালী যাত্রার উল্লেখ করা চলে, যা ধারাবাহিকতায় কয়েক শতাব্দী বাংলার জনচিত্তকে রসাবেশ রাখার চেষ্টা করেছিল।

কয়েক শতাব্দীব্যাপী সংস্কৃতিচর্চার এই অপরিবর্তনীয়তা মূল সমাজ কাঠামোর স্থিতিশীল কাঠিন্যকে মনে করিয়ে দেয় মানুষ নিরুপায় ভাগ্যের অধীন এবং অসহায়। ফলে যুগ যুগ ব্যাপী দেবদেবীকে ঘিরে এক ধরনের fear psychosis (ভীতি বিহ্বলতা) মানুষকে দাবিয়ে রেখেছিল সামাজিক ও আর্থিক পীড়নজাত চাপের মধ্যে।

চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে দেবীমাহাত্ম্যে ব্যাধ কালকেতুর রাজা হয়ে বসা, মনসার সর্পবাহিনীর বিষে মুসলিম শাসক কাজীর ও পার্ষদবর্গের মৃত্যু ইত্যাদির কাহিনী তৎকালীন ব্যর্থ শ্রেণীসংগ্রাম চিন্তার প্রতিফলন। এ ছাড়াও আর একটি জিনিস নিঃসন্দেহে লোকরঞ্জক ছিল— দেবদেবীর যৌনাকর্ষক শরীরী বর্ণনা বা তজ্জাতীয় ঘটনার ইঙ্গিত। সব মঙ্গলগানেই অশ্লীলতার কিছু না কিছু রুদ্ধ ইঙ্গিত রয়েছে। দু-একটা উদাহরণ তুলে ধরা যায়, যেমন শিবের অযোনীসম্ভবা কন্যা সর্পদেবী মনসার বিয়ে দেবার উদ্যোগ করে শিব যখন দেবী চণ্ডীর কাছে প্রস্তাব রাখলেন, 'ব্যবস্থা কর, মেয়ের বিয়ে দিই।' চণ্ডী বললেন, 'ঘরে কোনো সঙ্গতি নেই, মেয়ের বিয়ে দেবে কি? এয়োরমণীরা বিয়ের মঙ্গলগান গাইতে আসবে, অনুষ্ঠান শেষে তারা যখন পান সুপারী চাইবে তা দেবার উপায় তো নেই ঘরে। কী হবে তার?' শিব বলেন, 'তাতে কি? অনুষ্ঠান শেষে এয়োরমণীদের তাড়াবার ফিকির আমার জানা আছে' ঃ

"হাসি বলে শূলপানি আয়ো ভাণ্ডিতে আমি জানি
মধ্যে দাঁড়াই ল্যাংটা হয়ে
দেখিয়া আমার ঠান আয়োর উড়িবে প্রাণ
লজ্জা পাইয়া সবে যাবে ঘরে॥"

এই হল বিজয় গুপ্ত রচিত মনসামঙ্গলের অংশবিশেষ— যে গান ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে গাওয়া রীতিবদ্ধ ছিল।

বৈষ্ণব শাস্ত্রে মুখ্য হল পাঁচটি রস। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। বলা হয় পদাবলী কাব্য এই পঞ্চরসের সমবায়ে রচিত। পদাবলী সাহিত্যে শেষোক্ত মধুর রসের পদের সংখ্যাই বেশি বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। মধুর রসের আর এক নাম উজ্জ্বল রস। আদিরসাত্মক ভাব-সম্পদকেই বৈষ্ণবেরা মধুর বা উজ্জ্বল রসে ঠাঁই দিয়েছেন। এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ যে পদাবলী সাহিত্যে এই মধুর রসের প্রাধান্যই বেশি। মধুর রস আবার দুভাগে বিভক্ত— বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ। বিপ্রলম্ভের অর্থ হোল অনর্থক কলহ, ছলনা, প্রতারণা ও বিরহজনিত খেদ। এটি শৃঙ্গার রসের অন্তর্গত। প্রেম শাস্ত্রে সম্ভোগের অর্থ কী তা ব্যাখ্যা না করলেও চলে— এটি চূড়ান্ত শৃঙ্গার রস সৃষ্টিকারী।

পাঁচালী সাহিত্যের মতো তৎকালে ক্ষমতা বিন্যাসের মত্ততা প্রকাশ। আসলে মানুষ অতি অসহায় জীব একথা বোঝানোর চেষ্টা যাত্রাগানেও রয়েছে।

দেখা যাচ্ছে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত আমাদের সংস্কৃতিধারা দুটি মূল মানসিক বৈভবের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল। এক, ভয়বিস্ময়জনিত মোহমুগ্ধতা, দুই, অপ্রাকৃত প্রেমের নামে আদিরসজাত মোহমুগ্ধতা। সে যুগে সংস্কৃতিচর্চায় বিষয়-বস্তু ও ভাবসম্পদের অনড়তা, একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি ও আচারসর্বস্বতা অবশ্যম্ভাবী ছিল। বাংলার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে সংস্কৃতি সম্পদের ভিত্তি।

* * *

অতি দীর্ঘকাল ধরে সামন্ততান্ত্রিক শাসনের দাপটে বাংলার জনজীবন সামগ্রিকভাবে কোন কালেই নিষ্কণ্টক ছিল না। বৈষম্যের ভারে সমাজপীড়িত, "উত্তম মধ্যম যথা সৃজিল বিধাতা। সবাকার নাহি হেন সম্বলের কথা।" এই খেদ ও বিষণ্ণতা মঙ্গলকাব্যের সমাজচিত্রে। শিষ্টাচারহীন সমাজ ব্যবস্থার নানান কাহিনী যেমন "বেনে বড় দুষ্টশীল"। ধারে বিক্রিত মাংস নিয়ে দুষ্ট বেনে বাড়িতে লুকিয়ে থেকে স্ত্রী মারফৎ দরিদ্র পাওনাদারকে তাড়িয়ে দেয় বাড়ি নেই বলে। সেই বেনেই দরিদ্রের বন্ধকী দেওয়া সোনার গয়নার দাম নিয়ে ঠকায়, পরে ধরা পড়লে জবাব দেয়, "এতক্ষণ পরিহাস করিনু তোমায়।"

বানে দেশ ভেসে গেলেও রাজার প্রাপ্য থেকে প্রজার মুক্তি নেই— "বুলান মণ্ডল বলে শুন মোর ভাই। হাজিল ক্ষেতের শস্য তাহে না ডরাই" কিন্তু "মসীল করিবে রাজা হাতে দিয়া দড়ি। চাহিবে প্রথম মাসে এক তেঁহাই কড়ি॥" শস্য উৎপাদনে এক তৃতীয়াংশ (এক তেহাই) ছিল ভূমি রাজস্ব, প্রজার দেয়। বানে খরায় সেই দেয় থেকে প্রজার মুক্তি নেই। কুলশীলে সমাজমান্য কায়স্থ নেতা ভাঁড়ু দত্ত, রাজার পরামর্শদাতা। প্রজাপালক রাজাকে পরামর্শ দেয়—

"জিনিতে প্রজার মায়া জমি দিবে মাপিয়া
বন্দে বন্দে প্রজা যেন লয়
যখন পাকিবে খন্দ পাতিবে বিষম দ্বন্দ্ব
দরিদ্রের ধনে দিবে নাগা।"

দরিদ্র প্রজাকে ঠকানোর পরামর্শ সমাজবিধির বাইরে ছিল না। সমাজের দুর্নীতি উপরতলা থেকে নীচেরতলা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সামান্য গোয়ালিনীকে সাবধান করে দিয়ে ক্রেতাকে বলতে

"জল ফেলি দধি ঘোল দেও তো মাপিয়া
কড়ি নাহি দিব আগে দেখিব চাখিয়া॥"

দেবপূজায় অপোগণ্ড মূর্খ ব্রাহ্মণের অধিকার সমাজে নিষিদ্ধ নয়।

"মূর্খ বিপ্র বৈসে পুরে নগরে যাজন করে
শিখয়ে পূজার অনুষ্ঠান
চন্দন তিলক পরে দেব পূজে ঘরে ঘরে
চাউলের বোঁচকা বান্ধে টান॥"

আচার, নিষ্ঠা, কুল, পাঁজি ইত্যাদির ভেকধারি ঘটক ব্রাহ্মণ দাপটের সঙ্গে সমাজ শাসন করে— নিজের পাওনাগণ্ডা আর প্রাপ্য সম্মানের দাবীতে উচ্চরব ঃ

"গালি দিয়া লম্ডভন্ডে ঘটক ব্রাহ্মণ দণ্ডে
কুল পাঁজি করিয়া বিচার।
যে নাহি গৌরব করে সভায় বিড়ম্বে তারে
যাবৎ না পায় পুরস্কার॥"

সমাজের এই চিত্র ষোড়শ শতাব্দীতে আঁকা হয়েছে। বর্ণশ্রেণীভারে বিড়ম্বিত সমাজব্যবস্থায় এর চেয়ে সুখের সমাজচিত্র পাওয়া যাবে না। কয়েক শতাব্দীব্যাপী সমাজকাঠামোর একই ধারায় বাংলার গ্রাম ও নগরজীবন এক অনড় ও অপরিবর্তনীয় পরিবেশে স্থাণু হয়েছিল। ফলে সাংস্কৃতিক জীবনে বৈচিত্র্যহীনতার চাপ অসহনীয় ঠেকলেও তা মেনে নিতে হয়েছে সাধারণ মানুষকে। মূলত রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক পটভূমি তার জন্য দায়ী। জনসাধারণের রুচিবৈভবের উন্নতি ঘটে নি— সমসাময়িক কাব্যের আদর্শের বদলও ঘটে নি।

বৈষ্ণবদের আখড়ায় রাধাকৃষ্ণের পরকীয়া প্রেমলীলার রসগ্রহণ যেমন ধর্মাচরণ বলে গৃহীত হোত তেমনি কোন কোন দেবস্থানে বা আসরে বসে মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীর মাহাত্ম্য ও তাদের অনুগৃহীত বা অভিশপ্ত নায়ক-নায়িকাদের ধনসম্পদ লাভ বা বিপর্যস্ত অবস্থার কাহিনী শোনাও ধর্মাচরণ ছিল। হিন্দু ধর্মাচরণে চতুর্বর্গ ফললাভের আশা থাকে। এই সব গানের রচক ও গায়কদের গণিতায় শ্রোতাদের ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ— এই চতুর্বর্গ ফললাভের আশা জাগিয়ে দেওয়া হয়, গল্প শোনার পুরস্কার হিসেবে। ফলে, শতাব্দীর পর শতাব্দী সমাজভারে পীড়িত অসহায় মানবসন্তান বিস্মিত ভীতিবিহ্বলতায় মঙ্গলকাব্যের রস, পৌরাণিক যাত্রার উন্মাদনা ও বৈষ্ণবীয় কীর্তনের ভাবোল্লাস থেকেই ইহলোকের যন্ত্রণামুক্তির উপায় খুঁজছে। সাহিত্য ও শিল্পের বিচারসহ উপলব্ধি নয়, শ্রোতাদের নিছক আত্মনিবেদনে বাংলার সংস্কৃতিজগৎ নির্ধারিত বৃত্তসীমায় ঘুরপাক খেয়েছে।

* * *

অষ্টাদশ শতকে এসে সংস্কৃতির পটবদলের সূচনা দেখা গেল। ঠিক সেই সময়ে বাংলার শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের প্রভাবে সামাজিক জীবন একটা বড়ো পরিবর্তনের মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল। এই পরিবর্তন যে এক সুদূরবিস্তারী প্রতিক্রিয়ায় সক্রিয় হয়ে উঠেছিল পরবর্তী ঘটনাবর্ত থেকে তা বুঝতে পারা যায়। এই পরিবর্তন শুরু হয় বাংলায় মুর্শীদকুলী খাঁর সুবেদারীয় সময়ে (১৭১০-

১৭২৫ খৃষ্টাব্দ)। মুর্শীদকুলী খাঁ ভূমিরাজস্ব আদায়ের এক নতুন ব্যবস্থা করলেন। রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা বাদশাহের রাজস্ব বিভাগের অধীনে নিয়ে এসে নতুন এক শ্রেণীর ইজারাদের হাতে রাজস্ব আদায়ের ভার দিলেন। এঁরা হলেন দেওয়ান-কানুনগো-কারকুন।

এতকাল গ্রামের জমিদার প্রজার খাজনা আদায় করে এসেছে। তা ছিল ভূস্বামী পরিবারের বংশানুক্রমিক অধিকার। তারাই নবাবকে রাজস্ব জমা দেন। যুদ্ধের সময়ে নবাবকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেছেন। সামন্ততান্ত্রিক অধিকারে প্রজাশাসন করেছেন। সমাজ পরিবেশের শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায় ছিল তাঁদের। গ্রামসমাজের সঙ্গে নবাব বা বাদশাহের শাসনতান্ত্রিক যোগাযোগ একেবারেই ছিল না। ভূস্বামীরাই গ্রামসমাজের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। সমাজে ধর্মের পোষকতা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির পোষকতা, এমনকি প্রজার জীবিকা রক্ষার আনুকূল্য ভূস্বামীদের মর্জিমাফিক চলে আসতো। এইভাবে গ্রামসমাজ এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গোষ্ঠীতে আবদ্ধ থেকে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে গেছে।

মুর্শীদকুলী খাঁ এসে রাজস্ব আদায়ের জন্য ইজারাদার প্রথার সৃষ্টি করলেন যদিও পরবর্তী যুগে এই ইজারাদাররাই নিজেদের জমিদার বলে জাহির করে ও সমাজে প্রতিষ্ঠা আদায় করে নেয়। বংশানুক্রমিক ভূস্বামীরা উত্তরাধিকার সূত্রে অঞ্চল শাসন করার সুযোগ পেয়ে রাষ্ট্রকে নির্দিষ্ট বার্ষিক সেলামি দিত। এ-ব্যাপারে বাদশাহের কড়াকড়ি কোন ফরমান ছিল না যে প্রজাদের কাছ থেকে কোন একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ভূমিরাজস্ব আদায় করে তা বাদশাহের রাজস্ব হিসেবে জমা দিতে হবে। যদিও প্রজাদের বেশ মোটা হারে ভূমিকর দিতে হত জমিদার-রাজাকে, উৎপাদনের এক তৃতীয়াংশ। কিন্তু, রাজা-জমিদারের শাসন এক্তিয়ারে বাদশাহ বা তার নবাব-প্রতিনিধি মাথা গলাত না। নতুন ব্যবস্থা হল মুর্শীদকুলী খাঁর সময়ে।

কুলী খাঁ রাজকার্য চালাবার জন্য শক্ত ধরনের শাসন-প্রতিষ্ঠান তৈরি করলেন— রাজস্ব আদায় ও হিসেব রাখার জন্য ইজারা দেওয়ার ব্যবস্থার সঙ্গে ইজারাদার ও অন্যান্য কর্মচারী যথা কারকুন, মুন্সী, দেওয়ান ইত্যাদি নিয়োগের ব্যবস্থা করলেন। রাজকার্যে হিন্দু দেওয়ান ও কানুনগোদের নিয়োগ বেড়ে গেল— যাঁরা ফারসী ভাষায় দক্ষ ও অভিজ্ঞ ছিলেন। এই ইজারাদার কানুনগো মুন্সী দেওয়ানরাই পরে নতুন নতুন জমিদার-বংশের পত্তন করেন। ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থবংশজাত ব্যক্তিরা সরকারি উঁচু পদে ও জমিদারী সংগ্রহের সুযোগ পেল। পরের যুগে এদের বংশধরেরাই রাজা মহারাজা উপাধি পেয়েছিলেন। মুর্শীদকুলী খাঁ জমির পরিমাপের ব্যবস্থা করে রাজস্ব আদায়ের কড়াকড়ির সুযোগ নিলেন। আদায় বৃদ্ধি পেল। সংগতভাবেই মূল চাপ পড়লো সাধারণ মানুষের উপর; কৃষকদের উপর। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার বলেছেন :

The low revenue was forced up so high only by the heartless squeezing of the peasantry and inhuman torture of the Contractor-collectors. The pressure applied by the Nawab at the top naturally passed through the intermediate grades finally on to the actual cultivators who were left with the bare means of the annual increase of the fields and looms, above that minimum was taken away by the State.

পরবর্তীকালে সরফরাজ খাঁ (১৭২৫-১৭৪০ খ্রি.) ও আলীবর্দির (১৭৪০-১৭৫৬ খৃ) শাসনকাল পর্যন্ত একই ধারায় শাসনকার্য ও রাজস্ব আদায় অনুসৃত হয়েছে। ফলে কয়েক দশকের মধ্যে দুটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ সামাজিক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে। সাধারণ মানুষের পরিশ্রমজাত সম্পদের সঞ্চয় এসে জমেছে মুর্শিদাবাদের কোষাগারে। আগে বাংলার নবাবের কোষাগারে এই বিপুল ধনরত্নের পুঁজি সঞ্চয়ের সুযোগ ছিল না। মুর্শীদকুলী খাঁর সময় থেকে নবাব সিরাজ পর্যন্ত



...কালে মুর্শিদাবাদের কোষাগারে যে বিপুল ধনরত্ন সংগৃহীত হয়েছিল সে ঐশ্বর্য দেখে ক্লাইভ ...বাক হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর এই বিস্ময়ের কাহিনী ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সিলেক্ট কমিটির কাছে ...নিয়েছিলেন। বলাই বাহুল্য এতে সাধারণ মানুষের দারিদ্র্য বিশেষ করে কৃষক-চাষীপরিবারের ...ম চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে ঠেকে। এই সঙ্গে অবশ্যই বিদেশী বণিকের লুণ্ঠন ও জালিয়াতী এক ...ও ক্ষয়কারী শক্তি হিসাবে বাংলার সাধারণ মানুষের সম্পদ ও শক্তি একইসঙ্গে ধসিয়ে দিতে ...রু করে।

দ্বিতীয়ত, আর এক সামাজিক শক্তির উত্থান ঘটে যায় এই যুগে। নবাব-বাদশাহের অনুগ্রহপুষ্ট ...ওয়ান-মুন্সী-কানুনগোদের সমাজ। এঁরা হলেন উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ বংশজাত ...তুন যুগের সম্পদবান ও পরবর্তীকালে বংশানুক্রমিক জমিদার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত মানুষেরা। ...ষ্টাদশ শতক থেকেই এঁদের উত্থান। অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে তাঁরা ধনসম্পদ ও আভিজাত্য ...গ্রহ করে নিয়েছিলেন। এঁরাই হলেন নতুন যুগের সমাজ ও সংস্কৃতির নায়ক। পূর্বের রাজা ও ...স্বামীদের মতো সমকালীন কবি ও গায়কদের পোষকতা ও অনুগ্রহদানে এঁদের তৎপরতা সমাজ ...নতৃত্বের ও বনেদীয়ানার পরিচায়ক ছিল। সামাজিক মর্যাদা আদায় করার অন্যতম পদ্ধতি ছিল ...দেবদ্বিজে ও ধর্মাচরণে অনুগ্রহবণ্টন, গায়ক, কবি ও পণ্ডিতদের আর্থিক আনুকূল্য বিতরণ। ...হারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও মুন্সী রামচন্দ্রের অনুগ্রহে পুষ্ট হয়েছিলেনে কবি ভারতচন্দ্র। শাক্ত কবি ...রামপ্রসাদও রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পোষকতা পেয়েছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রের প্রত্যক্ষ অনুগ্রহ প্রদানেই নতুন ...যুগের সংস্কৃতি, খেউড় ও আখড়াই গান পুষ্ট হবার সুযোগ পায়। অর্থকৌলিন্য পাওয়ার সঙ্গে ...সঙ্গেই কৃষ্ণচন্দ্রের মতো বাংলার দেওয়ান মুন্সীরা উঠতি সমাজ-সংস্কৃতি চর্চায় এগিয়ে আসে।

এ যুগের পৃষ্ঠপোষকদের সংস্কৃতিমন্যতার এক নতুন ধারা দেখা গেল। আগেকার ধারায় ...সংস্কৃতিকলায় আদিরসের নমুনা কী মঙ্গলকাব্যে কী বৈষ্ণবগীতিতে ধর্মাচরণের সঙ্গে বাঁধা ছিল। ...একালে নতুন দেওয়ান ও মুন্সীদের চাহিদায় সংস্কৃতি চর্চায় ধর্মের বাঁধুনি শিথিল হয়ে পড়ল। ...বৈষ্ণব আখড়ার বাইরে সঙ্গীতস্রষ্টা ও গায়ককে ঘিরে দলবদ্ধ গোষ্ঠী গড়ে উঠল আখড়াই ...সংগীতের নতুন ধারা নিয়ে। অপ্রাকৃত প্রেমের আদিরসের প্রাধান্য খেউড় গানে রূপ নিল। নতুন ...যুগের সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান বিষয়বস্তু রূপে প্রতিষ্ঠা পেল খেউড়। এ যুগের গান হল খেউড়। ...নদীয়ার রাজসভায় যার অতিবিস্তৃত চর্চা ও সমাদরের কথা জানা যায়।

নতুন যুগের অন্যতম সৃষ্টি সম্পদ আখড়াই গান ও কবিগান। দুটি গানের বিষয়বস্তু ও ...প্রসঙ্গবিন্যাসে খেউড় একটা প্রধান অংশ নিয়ে রইলো। নতুন যুগের পৃষ্ঠপোষকদের রুচিপ্রসাদাৎ ...ধর্মের আঁটা-আঁটি বাঁধুনি থেকে যেমন সংস্কৃতিকলা মুক্তি পেল তেমনি সংস্কৃতিচর্চার বিষয়বস্তুতে ...আদিরস-প্রধান অপসংস্কৃতির বেনো জল এসে ঢুকলো। নতুন যুগের চিত্তবৈভব ও সমাজ পরিবেশ ...ধর্ম থেকে মুক্ত নয়া সংস্কৃতিকে ভিন্ন বিষয়বস্তুর গৌরবে সমুন্নত করে তুলতে পারে নি।

কেবল ধর্ম ও অতিপ্রাকৃত শক্তির মহিমা অটুট রেখে বিষয়-ঐতিহ্যে প্রবহমানতা বজায় ...রেখেছিল যাত্রাগানের অনুষ্ঠান। দেওয়ান মুন্সীদের পৃষ্ঠপোষকতায় পাঁচালী যাত্রা থেকে বহু চরিত্রে ...অভিনীত গোষ্ঠীযাত্রার পুনঃপ্রচার হল। চৈতন্যদেবের সময়ে শ্রীচৈতন্যের প্রত্যক্ষ উদ্যোগে বহু ...চরিত্রে অভিনীত যাত্রার অনুষ্ঠান হোত। চৈতন্যদেব নিজেই অন্যান্যদের সঙ্গে অভিনয়ে অংশ ...নিতেন। পরবর্তী যুগে সপ্তদশ শতকে গোষ্ঠীযাত্রার প্রায় অবলুপ্তি ঘটে। পরিবর্তে চালু হয় পাঁচালী ...যাত্রার। মঙ্গলকাব্যের কাহিনী অবলম্বনে একটি মানুষেই বিভিন্ন চরিত্রের একটানা অভিনয় করে ...পাঁচালীকাব্যের প্রয়োজনা সাঙ্গ করত। গোষ্ঠীযাত্রাগানের অনুষ্ঠান খরচসাপেক্ষ ছিল। দেওয়ান ...মুন্সীদের প্রত্যক্ষ চেষ্টায় ও অর্থানুকূল্যে আবার এই যাত্রাপালার পুনরাবির্ভাব ঘটল। আঙ্গিক

শৈলীর পরিবর্তন ঘটিয়ে শিশুরাম অধিকারী এ যুগের যাত্রাগানের পথপ্রদর্শক হলেন। যাত্রাগানের বিষয়বস্তুতে পৌরাণিক দেবদেবীর মহিমা গুণকীর্তন প্রধান অংশ নিয়েছিল। পরে ভারতচন্দ্রের আদিরসাত্মক বিদ্যাসুন্দর (১৭৫২) রচিত ও প্রচারিত হবার পর বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী আঠারো শতকের শেষ থেকে উনিশ শতকের মধ্যযাম পর্যন্ত যাত্রার সবচেয়ে জনপ্রিয় বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। কেবল বিদ্যাসুন্দর পালা নিয়েই অজস্র যাত্রাদল আবির্ভূত হয়। যাত্রাও শেষ পর্যন্ত ধর্মানুসৃত দেবদেবী মাহাত্ম্য থেকে মুক্তি পেল বিদ্যাসুন্দরের আদিরসের কল্যাণে।

## খেউড়, আখড়াই, হাফ আখড়াই

অষ্টাদশ শতাব্দীর লোকরঞ্জক সংস্কৃতিকলা হিসাবে আখড়াই, হাফ আখড়াই ও কবিগানের প্রাধান্য আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের এক বিশেষ অবস্থান নির্ণয় করে। কবিগান ও আখড়াই গান এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করা হলেও দুটি মূলত দু-ধরনের সঙ্গীতকলা। আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুতে কিছু কিছু সাদৃশ্য থাকলেও দুটি আলাদা জাতের সঙ্গীত-ব্যবস্থা। কবিগানের উদ্ভবের আগে আখড়াই গানের সৃষ্টি। পরবর্তীকালে অবশ্যই কবিগানে আখড়াই গানের প্রভাব এসে পড়ে। আখড়াই থেকে হাফ আখড়াই-এর জন্ম। যেহেতু একই শিল্পীগোষ্ঠী সাধারণত কবি ও আখড়াই গানে অংশ নিতেন তার ফলে লোকরঞ্জন ধারার মধ্যে নানাভাবে মিশ্রণ ঘটেছে। একে অপরকে প্রভাবিত করেছে।

সংবাদ প্রভাকরে ঈশ্বর গুপ্ত বলেছেন, ''শান্তিপুরস্থ ভদ্রসন্তানেরা আখড়াই গাহনার সৃষ্টি করেন। ইহা প্রায় দেড়শত বৎসরের ন্যূন নহে।'' উনিশ শতকের মধ্যযাম পর্যন্ত দেড়শো বছর ধরলে বলা যায় আঠারো শতকের শুরুতে আখড়াই গানের জন্ম। গানের সঙ্গে আখড়াই শব্দের উল্লেখ থাকায় অনুমান করা হয় বৈষ্ণবদের আখড়ায় এদের জন্ম। বৈষ্ণব সহযোগের প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পাওয়া গেলেও আখড়াই গানের বিষয়বস্তুতে রাধাকৃষ্ণের মিলন-বিরহ প্রসঙ্গ ও লীলাচাপল্যের চটুলতা দেখে এই অনুমান স্বীকার করে নিতে অসুবিধে হয় না। ঈশ্বর গুপ্তের উল্লেখ মতো অনুমান করা চলে আঠারো শতকের নদীয়া শান্তিপুরের বৈষ্ণবদের আখড়ায় এদের জন্ম। আখড়ায় দল বেঁধে এই গানের চর্চা হোত। বৈষ্ণব আখড়ার বাইরে চর্চা যখন শুরু হল তখন গানের দল বা কেবল গানের আখড়া গড়ে না নিলে এ গানের চর্চা সম্ভব নয়। গানের দলের সঙ্গে বাজনদার থাকতেন। গানের আসরে দু-দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা হোত। তবে কবিগানের মত উত্তর-প্রত্যুত্তরে থাকত না। এক বা একাধিক বিচারক থাকতেন। তাঁদের সিদ্ধান্ত মত গানে ও বাজনায় শ্রেষ্ঠতার বিচারে দলের জয়পরাজয় নির্ধারিত হোত।

সে-যুগের আখড়াই গান মোটেই সুরুচির গান ছিল না। ঈশ্বর গুপ্তের মত সাহিত্য-রুচি-বৈভবে লঘু মানসিকতার অধিকারী ব্যক্তিও বলেছেন, ''এই গানের রচকেরা অতিশয় অশ্রাব্য কর্দয্য বাক্যে গীত সমুদয় রচনা করিতেন, তৎকালে তাহা অত্যন্ত আমোদ হইত। এই মহাশয়দের সময় যন্ত্রের বিশেষ বাহুল্য এবং সুরের তাদৃশ পারিপাট্য ও আধিক্য ছিল না, সামান্য টপ্পার ন্যায় সুরের গান করিয়া তাহাকেই আখড়াই বিখ্যাত করিয়াছিলেন।'' এক্ষেত্রেও, ঈশ্বর গুপ্ত অবশ্য শান্তিপুরের আখড়াই গানের প্রসঙ্গে এসেছেন। পরবর্তী যুগে কলকাতায় আখড়াই গানের যেসব নমুনা, এমনকি ঈশ্বর গুপ্ত নিজেই অংশ নিয়েছেন এমন গানের বিষয়বস্তুতে রুচিহীন অশ্লীলতা কম ছিল না।

আখড়াই গানের উদ্ভবের প্রথম পর্বে সম্পূর্ণ গানে দুটি অংশ থাকত। খেউড় ও প্রভাতী। অশ্লীল খেউড় দিয়ে শুরু করে গান আরম্ভ হোত— শেষ হোত প্রভাতী অংশের গান দিয়ে। পরে আখড়াই গানে আরেকটি প্রসঙ্গ এসে পড়ে। সমগ্র গান তিন অংশে ভাগ হয়ে যায়। গানে নতুন



উপাদান যুক্ত হয়। 'ভবানী বিষয়' বা দেবী বিষয়ক গান। খেউড় ও প্রভাতীর আগে 'ভবানী বিষয়ক' গান গাওয়া হয়। ঈশ্বরচন্দ্র উল্লেখ করেছেন শান্তিপুর থেকে এই গানের ধারা চুঁচুড়া হয়ে কলকাতায় আসে এবং ক্রমে ক্রমে দেশ ও কালের পরিবর্তনের 'খেউড় ও প্রভাতীর আগে শুরু হয় ভবানী বিষয়, পরে খেউড়, তৎপরে প্রভাতী।'

সুতরাং, দেখা গেল পরিবর্তিত পদ্ধতিতে আখড়াই গানের দুটির বদলে তিনটি পর্যায়। দেবী বন্দনা দিয়ে শুরু করে খেউড় ধরা হতো। খেউড়ে থাকত চপল চটুল যৌনতাসর্বস্ব কথায় পুরুষ ও নারীর মিলন প্রসঙ্গে নানা ঈঙ্গিত বা বাক্যাবলী। শেষ অংশে প্রভাতী পর্যায়ে রজনী শেষে প্রভাতের আগমনে আশাভঙ্গের আক্ষেপ। অনেকটাই ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্যের ঢঙে। প্রতি রাত্রে বিদ্যা ও সুন্দরের গোপন বিহার শেষে রজনী প্রভাতে দুজনের আক্ষেপোক্তির আদলে।

আখড়াই গানের মধ্যে খেউড় একটা প্রধান অংশ। খেউড়ের অংশে বিষয় বিন্যাসে নদীয়া-শান্তিপুরের আখড়াই গানের খ্যাতি ও নিপুণতার বিশেষ ঐতিহ্য রয়েছে। আখড়াই গানের উদ্ভবের আগে নিছক চটুল খেউড় গান আলাদাভাবে গাওয়ার রীতি ছিল শান্তিপুরে। বিদ্যাসুন্দরে ভারতচন্দ্র লিখেছিলেন, ''নদে শান্তিপুর হৈতে খেঁড়ু আনাইব। নূতন নূতন ঠাটে খেঁড়ু শুনাইব।'' নদীয়ায় খেউড়ের প্রসঙ্গে বিশ্বকোষে বলা হয়েছে : ''নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের ঘরে শারদীয়া পূজার সময় নবমী-কীর্ত্তন উপলক্ষে নবমী পূজার দিন মহিষ বলিদানের পরে কাদা খেউড়ের সময় স্বয়ং মহারাজ, যুবরাজ ও আর আর রাজকুমারদিগকে নিজে নিজে এক-একটি স-কার ব-কারের খেউড় রচনা করিয়া গাইতে হইত এবং কখন কখন ছড়া কাটাকাটি ও উত্তর প্রত্যুত্তর শুনিতে পাওয়া যায়।''

এই উল্লেখ থেকেই পাওয়া যায় কবিগানের আদিরূপ, যার শুরু খেউড় থেকেই। আগে খেউড় কেবল আলাদা গান হিসেবে গাওয়া হোত। পরে শুরু হোল খেউড়ের সঙ্গীত লড়াই। পক্ষ প্রতিপক্ষে শাণিত চটুল বাক্যবিন্যাসে গানে বা ছড়ায় আক্রমণ রচিত হোত, প্রকাশ্য আসরে জনমণ্ডলীর মধ্যে। অশ্লীল ছড়া ও পদ্যরচনার মধ্য দিয়ে উত্তর প্রত্যুত্তরের প্রতিযোগিতাই পরবর্তী যুগের কবিগানের আদি আভাস। রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' বলেছেন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রই এই ধরনের সঙ্গীত লড়াই-এর প্রবর্তক। এই সঙ্গীত লড়াই কেবলি খেউড় গানের লড়াই। কৃষ্ণচন্দ্রের উৎসাহে প্রচারিত খেউড় গানের লড়াই পরবর্তীকালে কবির লড়াই-এ পরিচিত। অবশ্য কৃষ্ণচন্দ্রের আগেই কবিগানের উদ্ভব ঘটেছে। শুরুতে বৈষ্ণবীয় ভাবসম্পদের নমুনা রেখে পরে খেউড় ও চটুল শব্দভারে ছড়া রচনা আখড়াই গানেরও প্রথাবদ্ধ রীতি। সমাজ-নেতা কৃষ্ণচন্দ্র ওর পৃষ্ঠপোষকতা হওয়ায় এর বহুল প্রচার ঘটে গেল। আপামর জনরুচিতে বিকৃতির প্রসার ঘটল। নতুন সভ্যতার জন্মভূমি কলকাতায় তার পৃষ্ঠপোষক ''কলিকাতার সুবিখ্যাত রাজা নবকৃষ্ণ ও তৎপর কতকজন ধনাঢ্য ব্যক্তি ঐ কার্য্যে উৎসাহী হন॥'' নদীয়ার পর সপ্তগ্রাম, সপ্তগ্রাম থেকে চুঁচুড়া, চুঁচুড়া থেকে কলকাতা— এই হল আখড়াই সঙ্গীতের ঐতিহাসিক যাত্রাপথের পীঠস্থান। আখড়াই গানের সঙ্গে কলকাতায় কবিগানের লালন, সে আর এক ইতিহাস।

আখড়াই গানের প্রতিযোগিতায় উত্তর-প্রত্যুত্তর ছিল না। পরে কবিগানের চপল ও চটুল উত্তর- প্রত্যুত্তর ভঙ্গিমা আখড়াই গানের ধারায় মিশে নতুন ধরনের আখড়াই গান চালু হল— হাফ-আখড়াই। হাফ-আখড়াই গানের পদরচনা প্রণালী অনেকটা কবিগানকে অনুসরণ করেছে। কবিগানের মতই এখানে জয়পরাজয় নির্ভর করে পক্ষ-প্রতিপক্ষের উত্তর-প্রত্যুত্তরে। আদি গান খেউড়। খেউড় থেকেই আখড়াই ও কবিগান। পরে কবিগানের প্রভাবে আখড়াই গানের নতুন

রূপান্তর— হাফ আখড়াই। নীচের ছকটি দেখলে পরিবর্তনের ধারা আরো স্পষ্ট হবে।

খেউড় ——→ আখড়াই

↓ ↓

কবিগান ——→ হাফ আখড়াই

সমাজবিকৃতি ও মানসিক দৈন্যের চাপে খেউড় গানের উদ্ভব হোল কিন্তু খেউড় গানের চর্চা মুখ্য চর্চা হয়ে থাকেনি। খেউড়ের থেকে আখড়াই গানের উদ্ভব হোল, তবে খেউড় চর্চা শেষ হয়ে গেল এমন নয়। খোলা আসরে পরেও খেউড় গান হয়েছে। শান্তিপুরর খেউড়ের নিদর্শন এখন আর পাওয়া যায় না, কিন্তু পরবর্তীকালের খেউড়ের নিদর্শন দেখলে এই অপভাষ থেকে অশ্লীল ও অত্যন্ত রুচিহীন সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যাবে।

চুঁচুড়া থেকে আখড়াই গানে হরেক রকম বাজনার প্রচলন শুরু হল। নানারকম বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে হাঁড়ি কলসীও বাজানো হোত। চুঁচুড়ার গায়কেরা তখন মাঝে-মধ্যে কলকাতায় এসে গানের লড়াই দেখিয়ে যেতেন। সংবাদ প্রভাকরে উল্লেখ আছে বাইশরকম বাজনার প্রচলন করে বলে চুঁচুড়ার দলের নাম হয়েছিল বাইশেরা। হাঁড়ি কলসীর সঙ্গে যেসব বাদ্যযন্ত্র থাকতো সেগুলি হোল ঢোল, মন্দিরা, তানপুরা, বেহালা, সিটি, করতাল, মোচং, বাঁশী, জলতরঙ্গ, বীণা, বেণু, সেতার এবং আরো কয়েকটি। সব বাজনাই দরকার মত মিলিত সুরে বাজানো হোত। বাজনার চমকে আর জৌলুসে দর্শক-শ্রোতাদের আবিষ্ট রাখা সহজ ছিল।

শান্তিপুরের গানে বাজনার আধিক্য ছিল না। আধিক্য শুরু হয় চুঁচুড়া থেকেই। বাইশটি যন্ত্র বাজিয়ে তাঁরা গানের মহড়া জমজমাটি করে তুলতেন। বাজনাতেই শ্রোতাদের অর্ধেক জয় করা যেত। পরবর্তীকালের কলকাতায় আখড়াই গানের বাজনায় ও সংগতে কেউ কেউ বেশ নাম কিনেছিলেন। শান্তিপুরের গানেও সুরের পারিপাট্য ছিল না। সামান্য টপ্পার সুরে গান গাওয়া হোত। আসলে গানের লোকরঞ্জক দিকটি জমে উঠত খেউড়ের প্রকাশে। কলকাতায় এই গানের চর্চায় বিখ্যাত হয়েছিলেন কুলুইচন্দ্র সেন ও তাঁর ভাগ্নে নিধুবাবু। টপ্পা-খ্যাত রামনিধি গুপ্ত। এঁদের মত শিক্ষিত ও সুরজ্ঞ ব্যক্তিরা আখড়াই গানের রচয়িতা, সুরদাতা ও গায়ক হওয়া গানের চটুল শব্দবিন্যাসের ধার কমে আসতে থাকে। পরবর্তীকালে রচয়িতারা ঈশ্বর গুপ্তের ভাষায় 'ইতর শব্দ পরিহার পূর্ব্বক অতি সরল সাধুভাষায় সকল গান রচনা করিতে লাগিলেন।'

পরবর্তীকালে গানের ভাষায় কদর্যতার ধার অবশ্য কমেছিল কিন্তু গানে খেউড়ের অংশে চটুল-চাপল্য কম ছিল না। কলকাতার তথাকথিত শিক্ষিত-অশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত জনগোষ্ঠী বিশেষ একযুগে দীর্ঘদিন ধরে তা উপভোগ করে এসেছে। কলকাতার আখড়াই গানে আরো নতুন সুরবৈচিত্র্য সংযোগ ঘটানো হয়েছিল। ধ্রুপদী সঙ্গীতের মতো আলাপ ও রাগ-রাগিণীর বৈচিত্র্য ছিল। গানের সঙ্গে পাঁচ রকমের সংগতের ব্যবস্থা হোল, পিড়েবন্দী, দোলন, দৌড়, সবদৌড় এবং মোড়।

চুঁচুড়া থেকে কলকাতায় আখড়াই গানের প্রচলন প্রসঙ্গে ঈশ্বর গুপ্ত বড়বাজারের অধিবাসী এক কাশীনাথবাবুর নাম উল্লেখ করেছেন। কাশীনাথবাবুর বাগানবাড়িতে বছরে দু-একবার চুঁচুড়ার গায়কেরা গানের মহড়া দেখিয়ে যেতেন। কাশীনাথবাবুরা দুই পুরুষ কলকাতার বাসিন্দা ছিলেন। কাশীনাথবাবুর সময়কাল আঠারো শতকের শেষাংশ, অর্থাৎ তিনি রাজা নবকৃষ্ণের সমসাময়িক ছিলেন। চুঁচুড়া থেকে আসা সখের দলের বাইশ রকম বাদ্যযন্ত্র সহযোগে গানের লড়াই কলকাতায়



এক নতুন ব্যাপার। গানের মধ্যে চটুল খেউড় আছে, খেউড় শেষে রয়েছে মনোভঙ্গের ক্ষেপ। নতুন সভ্যতার লীলাভূমি কলকাতায় চুঁচুড়া দলের গান শুধু আনন্দের খোরাক জোগায় মাদকতারও সৃষ্টি করে। চুঁচুড়ার অনুকরণে শহরের বিভিন্ন শৌখিনবাবুদের আড্ডায় সখের ও পেশাদার আখড়াই দলের জন্ম হোল।

ব্যবসার লীলাভূমি কলকাতা। এখানে মনোরঞ্জক উপাদান নিয়ে ব্যবসা শুরু হতে দেরী হয় । সেই ব্যবসার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ধনীবাবুরাই। সেই প্রথম পর্বে কলকাতার হালসীবাগানে মিত গানের লড়াই-এর কথা গুপ্তকবি শুনিয়েছেন। নব্যধনী ও সৌখিনবাবুরা নিজেরাই দল বেঁধে, দরকার হলে ছড়া বেঁধে বা অশিক্ষিত পটু কবিদের সাহায্য নিয়ে বাজনা বাজিয়ে গানের ছড়া দিতেন। আমোদ আহ্লাদে খরচ করার মতো নোতুন বিষয় পেলে কলকাতায় নব্যবাবুদের ার রোখা যেত না। দল করে গানের লড়াই-এর রেষারেষি প্রথম প্রথম কলহ-বিবাদে গিয়ে পৌঁছোত। ঈশ্বরচন্দ্র বলেছেন, "ধনি ও সৌখিন বাবুলোকেরা ইহাদিগের এক এক পক্ষের পক্ষ হইয়া অর্থদান প্রভৃতি নানা প্রকারে সাহায্য করিতেন। উক্ত মহাশয়গণের গোঁড়ামি সূত্রে পক্ষ প্রতিপক্ষে নিয়ত বিবাদ-কলহ হইত।" হালসীবাগানের সঙ্গে একই কালে শ্যামপুকুর, জোড়াবাগান, নতলা ও রামবাগানে আখড়াই দল গড়ে উঠেছিল।

কলকাতা রাজা নবকৃষ্ণ আখড়াই গানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হয়ে উঠলেন। নদীয়ার যে কাজটি একদা করতেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, কোলকাতার সেই ভূমিকা নেন হেস্টিংসের মুন্সী নবকৃষ্ণ। তাঁরই আশ্রয়ে ছিলেন কুলুইচন্দ্র সেন। নবদ্বীপ চুঁচুড়ার আখড়াই গানকে ইনি প্রায় ঢেলে সাজিয়েছিলেন বলে উল্লেখ আছে। কুলুইচন্দ্র সম্পর্কে গুপ্তকবি লিখেছেন, "ঐ মহাশয় সংগীত শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পারদর্শী ছিলেন। তাঁহাকে আখড়াই গানের একজন জন্মদাতা বলাই কর্ত্তব্য হয়। যদিও তাঁহার পূর্ব্বে ও তৎসমকালে উক্ত বিদ্যায় বিশেষ নিপুণ আর কয়েক ব্যক্তি এতন্নগরে ও চুঁচুড়া প্রভৃতি স্থানে সজীব ছিলেন, তথাচ এই মহাশয়কে তাঁহাদিগের সকলের অপেক্ষা প্রধান হইতে হইবেক, যেহেতু ইনি আপন ক্ষমতা ও শক্তিদ্বারা পুরাতন বিষয়ের কোন কোন অংশ পরিবর্তন করত অনেক নূতন সৃষ্টি করেন। সুর ও গীতিকে নানা প্রকার রাগ-রাগিণীতে যুক্ত করতে নূতন নূতন পদ্যের সূচনা করিয়াছিলেন। আখড়াই গীতের ইনি যে সকল নূতন প্রণালী করেন সেই প্রণালীই অদ্যাবধি প্রচলিত।"

পরবর্তীকালে কুলুইচন্দ্রের ভাগ্নে টপ্পাখ্যাত নিধুবাবু আখড়াই গানের সর্বশেষ সংশোধন করেছিলেন। পরে ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছেন, নিধুবাবুর পদ্ধতিই কোলকাতার গানের রীতিপদ্ধতি হিসেবে চালু ছিল। প্রথমে দেবী প্রশস্তি গেয়ে পরে রতি মিলনের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে শেষাংশে রজনী প্রভাতের অপেক্ষা নিয়ে আখড়াই গানের রীতি। এই রীতি নিধুবাবু প্রচলিত। কলকাতায় নিধুবাবু দুটি আখড়াই দলের গঠন করেন। একটি দলে বাগবাজার ও শোভাবাজারের 'ভদ্রসন্তানেরা', অপর দলে পাথুরিয়াঘাটার মল্লিক পরিবারের নীলমণি মল্লিক ও তাঁর বন্ধুবর্গ ছিলেন। প্রথম দলের গান বেঁধে দিতেন নিধুবাবু। নিধুবাবুর সময়ে আখড়াই গানে বিখ্যাত হয়েছিলেন মোহনচাঁদ বসু। গুপ্তকবি এঁর সম্বন্ধে বলেছেন, "অদ্বিতীয় স্বরসিদ্ধ সুরজ্ঞ, কোকিলকণ্ঠ বাবু মোহনচাঁদ বসু।" এই মোহনচাঁদ পরে হাফ আখড়াই-এর প্রবর্তক পুরুষ হিসাবে গণ্য হয়েছেন। মোহনচাঁদ গান গাইতেন নিধুবাবুর বাগবাজারের দলে। নিধুবাবু গান রচনা করতেন, দলের গায়কমণ্ডলীকে গান শেখাতেন—কখনো কখনো নিজেও শ্রোতাদের সামনে হাজির হতেন। নিধুবাবুর শিক্ষকতাগুণে বাগবাজার শোভাবাজারের দল কলকাতার সেরা দল হিসেবে খ্যাতি পায়। কলকাতার অন্যান্য পল্লীর আখড়াই দলের সঙ্গে এই দলের গানের লড়াই প্রায় বাঁধা ব্যাপার ছিল।

নীলমণি মল্লিকের দলে গান ও সুর রচনা করতেন শ্রীদাম দাস। দাসমশাই তখনকার যাত্রাজগতের একজন নামী ব্যক্তিও ছিলেন। শ্রীদাসের সঙ্গে আখড়াই গানে অংশ নিতেন কুলুইচন্দ্রের পুত্র গোকুলচন্দ্র। নিধুবাবু, শ্রীদাম দাস, মোহনচাঁদ যখন আখড়াই জগতে খ্যাতি কিনছেন তখন ওঁদের সংগে গানের লড়াইয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে আসরে নামতেন রাম ঠাকুর, নসীরাম সেকরা এবং আরো কয়েকজন। আখড়াই গানে সুরের জন্যে খ্যাতি পেয়েছিলেন গরাণহাটার কৃষ্ণমোহন বসাকের দলের গোবিন্দ মালা। ইনি পরবর্তীকালে রামমোহনের ব্রহ্মসভার ব্রহ্ম সংগীত গাইতেন। শ্যামপুকুরের দলে গান লিখে ও সুর দিয়ে নাম কিনেছিলেন রামচাঁদ রায়। জোড়াসাঁকোর দলে গান রচনা ও সুর রচনায় বিখ্যাত হন দুর্গাপ্রসাদ বসু। এইভাবে একেক জন গায়ক ও সুরকারকে কেন্দ্র করে আখড়াই দল গড়ে উঠতো। আখড়াই বাজনায় যাঁরা নাম কিনেছিলেন ঈশ্বর গুপ্তের উল্লেখ থেকে তাঁদের নাম পাওয়া যায়। যেমন— বৈষ্ণবদাস, রামজয় সেন, রসিকচাঁদ গোস্বামী ন্যাটাবলাই, নবু আঢ্য, রাজু আঢ্য, রূপচাঁদ, পার্বতীচরণ বসু, গোলাম আব্বাস প্রমুখ।

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে আখড়াই গানের দ্রুত প্রসার কোলকাতার বাবু সমাজে ছড়িয়ে পড়ল। পল্লীতে পল্লীতে যেখানেই জমিদার, বেনিয়ান, মুৎসুদ্দি ইত্যাকার হঠাৎ গড়ে ওঠা নব্যবাবুদের বসবাস ছিল সেখান তৈরি হয় সখের ও পেশাদারী আখড়াই গানের দল। আখড়াই দলের পোষকতা করা সেকালে হঠাৎ বিত্তবানবাবুদের সামাজিকতা প্রতিষ্ঠা সঞ্চয় করার ব্যাপার ছিল। এর জন্যে তাঁরা যেমন অর্থ জোগাতেন, পেশাদারী দল আনিয়ে গানের লড়াইয়ের আসর বসাতেন তেমনি, কেউ কেউ গান রচয়িতা, গায়ক, সুরকার বাদকদের পোষকতা করে দল গড়তেন। বড়বাজারে কাশীনাথবাবুর পৃষ্ঠপোষকতায় কোলকাতায় প্রথম এই গানের প্রচলন হলেও শোভাবাজারের মহারাজা নবকৃষ্ণ পরবর্তীকালে হলেন এই আখড়াই গান চর্চার প্রধান পৃষ্ঠপোসক। রাজা নবকৃষ্ণের মৃত্যুর পরেও আখড়াই গানের ধারা তাঁর দত্তকপুত্র গোপীমোহন এবং পুত্র রাজকৃষ্ণ বজায় রেখেছিলেন। তাঁরাও গায়ক, সুরকার ও বাদকদের মস্ত বড়ো পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ঈশ্বর গুপ্তের মতে, 'আখড়াই গাহনা সর্বশেষে স্বর্গগত সুবিখ্যাত বহুগুণজ্ঞ রাজা গোপীমোহন বাহাদুরের ভবনে যতবার হইয়াছে এত অধিক বার কোনখানেই হয় নাই।

রাজা নবকৃষ্ণের দেখাদেখি এগিয়ে এসেছিলেন পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর পরিবার, জোড়াসাঁকোর সিংহপরিবার। রামবাগানের দত্তপরিবার। গরাণহাটার বাবু কৃষ্ণমোহন বসাক, শোভাবাজারের কালীশংকর ঘোষের পরিবার, শ্যামপুকুরের দিগম্বর মিত্র, হলধর ঘোষ প্রমুখ। এঁরা প্রত্যেকেই নিজের নিজের পল্লীতেই আখড়াই দলের পত্তন করেছিলেন। দলগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা লেগেই থাকত। গানের লড়াইয়ে যাদের জয় হোত ঈশ্বর গুপ্তের ভাষায়, 'যাঁহারদিগের সুর ও গাহনা ভাল হইত তাঁহারা জয়পতাকা প্রাপ্ত হইয়া ঢোল বান্ধিয়া আনন্দপূর্ব্বক গমন করিতেন। জয়ের পর পাড়া কাঁপিয়ে স্ব-পল্লীতে চলে যাওয়াই ছিল রীতি।

বিশেষ করে নিধুবাবু পৃষ্ঠপোষিত বাগবাজারী দলের সংগে গানের লড়াই তখন যোগ্যতা বিচারের মাপকাঠি ছিল, কেননা সেকালে নিধুবাবুর দলকে গানের লড়াইয়ে হারানো সহজ ছিল না। ঈশ্বরগুপ্তের ভাষায় "...তাঁহার দিগের সকলের সহিত বাগবাজারের দলের দুই একবার করিয়া যুদ্ধ হইয়াছিল। এমত শুনিতে পাই, সেই সমস্ত সময়ে বাগবাজারের পক্ষেই অধিক সংখ্যায় জয়লাভ হইয়াছে। কারণ এ পক্ষে সুর ও গীত বিষয়ে রামনিধি গুপ্ত এবং গাহনা পক্ষে অদ্বিতীয় স্বরসিদ্ধ সুরজ্ঞ কোকিলকণ্ঠ বাবু মোহনচাঁদ বসু প্রভৃতি গায়ক, সুতরাং দুই দিক উত্তম হওয়াতে বাগবাজারের জয়ের সম্ভাবনাই অধিক ছিল।" তবে "সকল পক্ষই পরস্পর জয়ি ও যশস্বী হইবার জন্য যথাযোগ্য যত্নের ত্রুটি করেন নাই, সাধ্যমত সাধন করিয়াছেন, ইহাতে কোন কোনবার বাগবাজারের দল পরাভব হইয়াছেন।"

গুপ্তকবি উল্লেখ করেছেন গোপীমোহন দেব সম্ভবত আখড়াই গানের উল্লেখযোগ্য শেষ পৃষ্ঠপোষক। গোপীমোহনের মৃত্যু হয় ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে। বিশের দশক পর্যন্ত তাঁর বাড়িতে আখড়াই গানের অবিরাম চর্চা ছিল। ১৮৫৪ সালে সংবাদ প্রভাকরে ঈশ্বরচন্দ্র লিখছেন, "৩০ বৎসর হইল আখড়াই গাহনা রহিত হইয়াছে, ইহার মধ্যে অনেকে অনেকবার উদ্যোগ করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।"

* * *

হাফ আখড়াইয়ের প্রবর্তক হিসেবে নিধুবাবুর স্নেহধন্য মোহনচাঁদ বসুর নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। মোহনচাঁদ নিধুবাবুর বাগবাজারী আখড়াই দলে প্রথম যৌবনে গান শেখেন। নিধুবাবুর কাছেই নাড়া বাঁধেন। নিধুবাবুর প্রত্যক্ষ শিক্ষায় মোহনচাঁদ গান রচনায়, সুর সংযোজনে ও গায়কীতে শুধু পারদর্শী হয়ে ওঠেন না গলায় সুরমাধুর্য প্রায় কোলকাতা জয় করে নেন। মোহনচাঁদ বাগবাজারের অধিবাসী ছিলেন। উল্লেখ আছে শুধু হাফ আখড়াই নয় দাঁড়া কবির গানের চলও মোহনচাঁদের সৃষ্টি। দুটি বৈঠকী গানই মোহনচাঁদের সুরে ও ঢঙে গাওয়া হোত।

ইতিমধ্যে আখড়াই গানের পাশাপাশি এই শহরে কবিগানের চর্চা শুরু হয়ে গেছে। আখড়াই গানের জায়গায় কবিগানের জনপ্রিয়তা বাড়তে শুরু করেছে। আখড়াই গানের চল কমতে শুরু করেছে। উনিশ শতকের এক চতুর্থাংশ তখন শেষ, এই সময় আখড়াই গান ভেঙে হাফ আখড়াইয়ের সৃষ্টি হল।

কবি মনোমোহন বসু হাফ আখড়াই সংগীত সৃষ্টির এক ইতিহাস দিয়েছেন। তাতে জানা যায়, কেবার জোড়াসাঁকো দলের সঙ্গে বাগবাজারের দলের লড়াই হয়। বাগবাজারের দলে প্রধান ব্যক্তি ছিলেন মোহনচাঁদ। জোড়াসাঁকোর দলে প্রধান ছিলেন কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়। মোহনচাঁদ সেদিন নিজ গানে অংশ নেননি, দলকে গানে সুরে বেঁধে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। মেছুয়াবাজারে রামমোহন মল্লিক মশায়ের বাড়িতে গানের আসর বসে। মোহনচাঁদের বাগবাজারী দল গানে বাজনায় শ্রোতা দর্শকদের মাত করে দেয়। বাগবাজারের দল বিজয়ী আখ্যা পেল। দলের সাফল্যে উৎফুল্ল হয়ে মোহনচাঁদের পিতৃব্য সেই আসরে শ্রোতাদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বললেন, এর চেয়ে ভালো গানের আসর তাঁরা বসাবেন, আর লড়াই হবে জোড়াসাঁকোর সঙ্গেই। জোড়াসাঁকোর দল এই চ্যালেঞ্জ নিতে দ্বিধা করেনি। মোহনচাঁদ সেদিন গানের আসরে উপস্থিত ছিলেন না। পরে শুনলেন চ্যালেঞ্জের কথা। শুনে তাঁর মনে হয়েছিল এবার একটা নতুন কিছু করতে হবে—নতুন এক সংগীত রীতির উদ্ভাবন। আখড়াই তখন লোকে নিচ্ছে না। চটকদারী কবিগানের চল বেড়ে গেছে। তিনি ভেবে দেখলেন আখড়াইয়ের অনুরণে একটা কিছু করা যেতে পারে। আখড়াই গানের রাগ-রাগিণীর অত্যধিক নিপুণতা বাদ দিয়ে আরো একটু সরল ঢঙে কবিগানের মত উত্তর-প্রত্যুত্তরের ব্যবস্থা রেখে গান বাঁধলেন। খুবই গোপনে নতুন গান শেখানোর ব্যবস্থা হল। প্রতিপক্ষ জোড়াসাঁকোর দলকে তা জানতে দেওয়া হয় নি।

নির্দিষ্ট দিনে সংগীত সংগ্রাম শুরু হল। এবারে কিন্তু মোহনচাঁদ বাগবাজারী দলে মূল গায়ক হিসেবে আসরে আবির্ভূত হয়েছেন। ১৮৩২ সালের জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে রামমোহন মল্লিকের বাড়িতেই আসর বসল। জোড়াসাঁকো দলের মূল গায়ক ছিলেন সেই কাশীনাথ মুখোপাধ্যায় শেষ পর্যন্ত গানের লড়াইতে নতুন রীতির গানে বাগবাজারের দলের জয় হল। মনোমোহন বসু লিখছেন, বোধহয় তৎকালে প্রশংসার শব্দে বাটীর থাম পর্যন্ত কাঁপিয়াছিল, সেবারে জোড়াসাঁকো

ও পাতুরেঘাটার সংযোজিত মহাশয়েরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া পরে সেই দৃষ্টান্ত অনুসারে সুর প্রস্তুত করণে শিক্ষিত হইলেন। ২৮ জানুয়ারি ১৮৩২ সালের সমাচার দর্পণে খবরের সঙ্গে বলা হোল, 'ইহা প্রকৃত পক্ষে আখড়াই গান নহে এবং কবিওয়ালার মতও বলা যায় না এ জন্যে অনেকেই কহেন নিম আখড়া অথবা কেহ কহেন হাপ-আখড়ার লড়াই হইয়াছিল।''

বিশেষজ্ঞেরা ধরেই নেন হাফ আখড়াই সংগীতের প্রচলন ১৮৩২ সালের জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে। তখন আখড়াই সংগীত প্রায় লোপ পেতে বসেছে। তার স্থান নিচ্ছে কবিগান যা কবির লড়াই নামে খ্যাত, সেখানে গান বা বাজনার বাঁধুনির চেয়ে বড়ো হল কবির বক্তব্য এবং পক্ষ ও প্রতিপক্ষের ছন্দোবদ্ধ আক্রমণাত্মক চটুল উক্তি। ঠিক এই সময়ে মোহনচাঁদ সৃষ্টি করলেন তথা কথিত হাফ-আখড়াই। এতে আখড়াইয়ের আংশিক শৈলীর সঙ্গে কবিগানের মিশ্রণ ঘটেছিল। জয়পরাজয় নির্ধারিত হোত পক্ষ-প্রতিপক্ষের উত্তর-প্রত্যুত্তরে। আখড়াই গানের দেবীবন্দনা, খেউড় ও প্রভাতীর নির্দিষ্ট বিষয় বিভাগ বজায় রইল না। দেবী বন্দনা (ভবানী বিষয়ক) আর প্রভাতী অংশ হাফ আখড়াই গানে বাদ পড়ে গেল। গানের শেষাংশে এল খেউড়, শুরু হয় সখী-সংবাদ দিয়ে। তবে আখড়াইয়ের সব বাজনাই হাফ আখড়াই গানে ব্যবহার করা হোত।

আসরে প্রথম পক্ষ সখী সংবাদ গাইবার পর অপর পক্ষ পাল্টা সখী-সংবাদ গেয়ে উত্তর দেবার চেষ্টা করতো। সখী সংবাদে কৃষ্ণপ্রেমের আকুলতা দেখিয়ে শুরু করা হোত। অপর পক্ষ পাল্টা প্রেমের প্রকাশ দেখিয়ে তির্যক ব্যঙ্গে প্রতিপক্ষকে অপদস্থ করার সুযোগ নিত। এইভাবে কয়েকবার (সাধারণত দু-বার) পক্ষ-প্রতিপক্ষ সখী-সংবাদের মাধ্যমে প্রতিযোগিতা শুরু করে শেষ অংশে খেউড় গানে চলে আসতো। খেউড়ের মধ্য দিয়ে চটুল বাক্যবিন্যাসে চূড়ান্তভাবে অপদস্থ করার সুযোগ হোত। জয়পরাজয় নির্ধারিত হোত। প্রতি আসরে বিশিষ্ট কয়েকজন ব্যক্তিকে বিচারক হিসেবে মনোনীত করে গান বিচারের ভার দেওয়া হোত।

এইভাবে আখড়াই গান ভেঙে ঐ গানের মূল রীতি পদ্ধতি হাফ আখড়াই গানে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা হয়েছিল। এখানে দেবী বন্দনার ভণিতা নেই, সখী-সংবাদে প্রেমের প্রকাশ ভঙ্গিমায় অলৌকিকত্বের আভাস নেই, খেউড়ে গানে অশালীন নিম্নরুচির পোষকতা, আর রয়েছে একই সঙ্গে একাধিক খেউড় গানের ব্যবস্থা, খেউড়ের মাধ্যমে উত্তর-প্রত্যুত্তর দেওয়ার রীতি। হাফ আখড়াই সহজে চটুল চটকদারির প্রভাবে নিম্নগামী সামাজিক রুচির প্রশ্রয়ে শহুরে জন-সংস্কৃতির আসরে স্থান পেয়ে গিয়েছিল। মনোমোহন বসু লিখছেন, '' মোহনচাঁদ বসু পূর্ব্ব কবিতানুরূপ হাফ আখড়াইয়ের অশেষ শ্রীবৃদ্ধি করিয়ে তুলিলেন। তাঁহার জীবদ্দশায় এই রাজধানীতে এই সঙ্গীত সংগ্রামের চূড়ান্ত আমোদ হইয়া গিয়াছে বহু বহু পল্লীতে অতি প্রসিদ্ধ দল সকল ছিল এবং নামজাদা বড়ো বড়ো দোহের ও বাদকগণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কত ধনকুবের ইহার দল প্রস্তুত করণে পরস্পরের টক্করা টক্করিতে বিপুল অর্থের শ্রাদ্ধ করিতেন।''[৩৭]

পরবর্তীযুগে মনোমোহন বসু নিজেই হাফ আখড়াই গান রচনা করে বিভিন্ন দলের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। সেটা ছিল উনবিংশ শতাব্দীর '৭০-'৮০ দশক। হাফ আখড়াই গান সাংস্কৃতিক কলা হিসেবে কতটা জনরুচির উন্নয়নে সহায়ক ছিল মনোমোহন বসু সে প্রশ্নে যান নি। তবে এ কথা স্বীকার করেছেন যে পৃষ্ঠপোষকেরা ''পরস্পরের টক্করা টক্করিতে অর্থের শ্রাদ্ধ করিতেন।'' বাজনা ও সংগীতকলার আড়ম্বরে হাফ আখড়াই গান আখড়াই গানের চেয়ে নিম্নস্তরের হলেও তা কবিগানের মতো সোজাসুজি চটুল বক্তব্য ও সরাসরি আক্রমণাত্মক বাক্য সংযোজনে প্রবহমান নিম্নরুচির পোষকতা করে কিছুকাল জনপ্রিয়তার পুরোভাগে ছিল।

প্রচলিত হবার পর আখড়াই গানের পুরোনো দলগুলি হাফ আখড়াই গানের দলে পরিবর্তিত



হয়ে নোতুন করে গানের লড়াইয়ে মেতে ওঠে। কিন্তু ততদিনে শহরে কবিগানের আসর যেমন জাঁকিয়ে বসেছে তেমনি জনরুচির পরিবর্তনও শুরু হয়েছে। প্রতিযোগিতায় হাফ আখড়াই পাশাপাশি অবস্থান করলেও কবিগানের আড়ম্বরহীন স্বল্প খরচের অনুষ্ঠান আর উত্তর-প্রত্যুত্তরের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, খেউড়, টিটকিরি, তির্যক ব্যঙ্গ সহজে শ্রোতা দর্শকের মন আকর্ষণ করে নিতে পারে। ইতিমধ্যে অবশ্য কিছু প্রতিভাসম্পন্ন জনচিত্তজয়ী স্বভাব-কবির আবির্ভাব ঘটেছে যাদের অনুষ্ঠান এবং মাৎ করা খেস্‌সা খেউড় ও ব্যঙ্গোক্তি নিম্নরুচিকে বেঁধে রাখত।

কিন্তু এরই মধ্যে জনরুচির পরিবর্তনও উল্লেখযোগ্য ঘটনা। শহরে জীবনযাত্রার সাংস্কৃতিক বিন্যাসভূমি পাল্টাতে আরম্ভ করেছে, শিক্ষা ও মানসিকতায় পরিবর্তন আসছে। হঠাৎ গজিয়ে ওঠা শহুরে নববাবুদের সমাজও বদলে যেতে শুরু করে। সামন্ততন্ত্রীয় নিম্নরুচির সঙ্গে মিশ খাওয়া বেনিয়ে সভ্যতার তলানীর ঝাঁজ থেকে শহুরে সংস্কৃতি মুক্ত হাওয়ার স্পর্শ পেতে চলেছে। শিক্ষা বিস্তারের আন্দোলন, সতীদাহ বিরোধী আন্দোলন, বিধবা বিবাহ, বহু বিবাহ, বাল্য বিবাহ, নীলবিদ্রোহ ইত্যাকার প্রশ্ন নিয়ে সমাজ-সংস্কারের চিন্তা সমাজের রুচি বদলাতে সচেষ্ট হয়েছে।

কবিগানের পাশাপাশি দাঁড়াতে চেষ্টা করে হাফ আখড়াই গান শুধু রুচি বিকাশের পোষকতার সহায়তা পেলেও সম্ভবত আনুষ্ঠানিক আড়ম্বের বাহুল্যে বহু ব্যাপ্তি পায় নি। কবিগানে রুচিবিকৃতি আরো তির্যক, রূঢ় ও প্রত্যক্ষ। যদিও কিছুকাল পরেই কবিগানের পোষকতা শহুরে আবহাওয়ায় ঠাঁই পেল না, অতি সহজ তার প্রদর্শনকলা সত্ত্বেও। ততদিনে নববাবুদের সমাজে যে-কোনো রকম শোনার জন্য অঢেল পয়সা ওড়ানো ও সময়-ব্যয়ের বিলাসবাহুল্য অপসৃত। তবু কিছুকাল হাফ আখড়াই গানের চর্চা পুরনো দলগুলি চালিয়ে যেতে চেষ্টা করে, নতুন নতুন দলেরও উত্থান হয়, কিন্তু সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ার মতো সাংগনিক জোর এবং সামাজিক পরিস্থিতি আখড়াই হাফ আখড়াইয়ের ছিল না। কোলকাতা-কেন্দ্রিক গ্রাম্য ও বেনিয়া সভ্যতার অপমিশ্রণজাত সংস্কৃতি হোল আখড়াই হাফ আখড়াই।

আখড়াইয়ের মতো হাফ আখড়াই গানের লড়াইয়ের খবর সেকালের বাংলা সংবাদপত্রে ঠাঁই পেত। অনেকটা এখনকার সিনেমা থিয়েটারের মতো। হাফ আখড়াই গানের মধ্যজীবনে (১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দ) জোড়াসাঁকো আর বাগবাজারের দুই দলের মধ্যে আরেকটা লড়াইয়ের খবর পাওয়া যায়।[৩৮] দুই-ই পুরানো প্রতিদ্বন্দ্বী দল, একদা যাদের লড়াইয়ের মধ্যে হাফ আখড়াই গানের জন্মলাভ ঘটেছিল। জোড়াসাঁকোর নবকুমার মল্লিকের বাড়িতে সেবার আসর বসে। এই আসরের গান সেদিন গুণগ্রাহীদের যথেষ্ট নাড়া দেয়। সংবাদ প্রভাকর ও চন্দ্রিকায় এ নিয়ে বিতর্কের সূচনাও হয়। গানের লড়াইয়ের সেদিনেও বাগবাজারের দল বিজয়ীর সম্মান পেয়েছিল। সেদিন গানে উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল গানের মধ্যে খেউড়ের প্রকাশ।

বাগবাজারের দল জোড়াসাঁকোর দলকে রমণীরূপে ভজনা করে প্রেমের অনুরাগ জানায়। জোড়াসাঁকোর দল তার অতি কটু উত্তর দিল। তার প্রশ্ন, সহোদরা বোন ফেলে অন্য রমণীতে মন কেন? বাগবাজারের দল হার না মেনে সরাসরি প্রতিপক্ষকে বিবাহ প্রস্তাব দেয়। জোড়াসাঁকোর দল প্রত্যুত্তরে বাগবাজারের প্রতিপক্ষকে সহোদরা বোনের স্বামী (গানের ভাষায় ''বোন মেগো'') বলে সম্বোধন জানিয়ে গান শেষ করে। এইভাবে অশ্লীল চটুল উক্তি-প্রত্যুক্তি হল হাফ আখড়াই গানের অন্যতম বিশেষত্ব। হাফ আখড়াই গানে সহোদরা বোনকে নিয়ে অশ্লীল কটূক্তি সেকালে সাধারণ ব্যাপার ছিল। অনেক গানের খেউড়ে তার ব্যবহার দেখা গেছে। উনিশ শতকের শ্রোতা দর্শকেরা নির্বিবাদে এসব উপভোগ করে এসেছেন। তারিফও করেছেন, ''প্রশংসার শব্দে বাড়ির থামও কাঁপিয়া যাইত।''

কীভাবে হাফ আখড়াই গানের শ্রেষ্ঠত্বের বিচার হোত বিশ শতকের একটি বিরল অনুষ্ঠানের খবর থেকে নীচে তুলে ধরা হোল ঃ

"গত ২২শে অগ্রহায়ণ (১৩২৫ সাল) রবিবার শোভাবাজার রাজবাড়িতে হাফ আখড়াই গান হইয়া গিয়াছে। বহুদিন পরে আবার হাফ আখড়াই গান হইবে শুনিয়া সেখানে বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল। কাঁসারীপাড়া ও জোড়াসাঁকোর দলের গান হয়। কাঁসারীপাড়ার পক্ষে সংগীত রচয়িতা ছিলেন শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দাস, জোড়াসাঁকোর পক্ষে ছিলেন শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু।....কাহারা জিতিল ইহার উত্তরে বিচার্য এই যে, কাহার কত দোষ, কত গুণ? প্রতি বিষয়ে ১০০ হইলে ও ৩৩ শে পাশ ধরিয়া লইলে--"

| ১। কাঁসারীপাড়া | ২। জোড়াসাঁকো |
|---|---|
| ক) প্রথম ঐক্যতান বাদ্যে ফেল ১০০ নম্বরের মধ্যে ৩০। | ক) প্রথম ঐক্যতান বাদ্যে পাশ ১০০ নম্বরের মধ্যে ৫০। |
| খ) ঠাকরুণ বিষয়ক গানে ফেল ১০০ নম্বরের মধ্যে ০। | খ) ঠাকরুণ বিষয়ক গানে পাশ ১০০ নম্বরের মধ্যে ৮০। |
| ক) ১ম সখীসম্বাদ ঐক্যতান বাদ্যে ১০০ নম্বরের মধ্যে ৫০। | ক) ১ম সখীসম্বাদ ঐক্যতান বাদ্যে ১০০ নম্বরের মধ্যে ৫৫। |
| খ) ১ম সখীসম্বাদ গানে ১০০ নম্বরের মধ্যে ৫০ পাশ। | খ) ১ম সখীসম্বাদ গানে ১০০ নম্বরের মধ্যে ৬৫। |
| ক) ২য় সখীসম্বাদ ঐক্যতান বাদ্যে ১০০ নম্বরের মধ্যে ৬০ পাশ। | ক) ২য় সখীসম্বাদ ঐক্যতান বাদ্যে ১০০ নম্বরের মধ্যে ৫৬ পাশ। |
| খ) ২য় সখীসম্বাদ গানে ১০০ নম্বরের মধ্যে ৩৩ পাশ। | খ) ২য় সখীসম্বাদ গানে ১০০ নম্বরের মধ্যে ৬০ পাশ। |
| ক) খেউড় ঐক্যতান বাদ্যে ১০০ নম্বরের মধ্যে ২৫ ফেল। | ক) বিরহ ঐক্যতান বাদ্যে ১০০ নম্বরের মধ্যে ৮৫ পাশ |
| খ) খেউড় গানের গাহনায় ১০০ নম্বরের মধ্যে ২৯ ফেল। | খ) বিরহ গানে পূর্ণ পাশ ১০০ নম্বরের মধ্যে ৯৯। |
| ক) চাপান দিয়া রক্ষা করিতে পারে নাই বলিয়া চাপান ঠিক হয় নাই; সুতরাং চাপানে ফেল। ১০০ নম্বরের মধ্যে ৩০ ফেল। | ক) উত্তর শাস্ত্রসঙ্গত ঠিক হওয়ায় এবং দ্বিতীয় উত্তরে চাপান নষ্ট করিয়া দিতে পারায় পরে তাহার লিখিত উত্তর না পাওয়ায় সম্পূর্ণ পাশ। ১০০ নম্বরের মধ্যে ৯৯। |
| এই সকল কারণে কাঁসারীপাড়ার দল হারিয়াছে। | এই সকল কারণে জোড়াসাঁকোর দল সম্পূর্ণ জিতিয়াছে। |

পরবর্তী যুগে বিশ শতকে হাফ আখড়াই গানে প্রদর্শন -আঙ্গিকের কিঞ্চিৎ বদল ঘটলেও বুঝতে অসুবিধে হয় না কীভাবে সংখ্যা দিয়ে গুণগত মান নির্ধারণ করা হোত। প্রতি গান ও গানের সহযোগী ঐক্যতান বাজনার আলাদা করে বিচার হোত। উপরের পদ্ধতি বিচারের ধারায় জোড়াসাঁকোর দল জয়ী বলে গণ্য হয়েছে।

পরিশিষ্ট॥ ১॥

কবি মনোমোহন বসু রচিত আসরে গাওয়ার জন্য খেউড়।

**আসরীখেস্‌সা খেউড়**

মহড়া!

কি যুগলমূর্ত্তি! ভেলা কীর্ত্তি সহরে দেখাও!
চুণোগলির সাহেব বিবী, যেমন দেবা তেম্নী দেবী
রকম্ বেশ, কিন্তু শেষ্, থাকলে হয়—ওরসে ভাগ্নে হলে লজ্জা পাও!

চিতেন।

পাড়াগেঁয়ে জংলি আমায় হায়্, কও কথায় কথায়্!
নিশি দিবা দাসীর এত সেবা, সকল্ ভেসে যায়্!

(ফুকা)

অসভ্য ব'লে, ত্যজিলে, আর আমায় নাহি চাও!
ঠাকুরঝিয়ে নিয়ে গাড়ী করে, তাই বেড়াতে যাও!
কোমর ঘেরা ঘাঘরা পরায়ে, আয়ার সাজ সাজায়ে,

(মেলতা)

তারে হোটেল ঘরে নিয়ে খানা খাও।

(মনোমোহন গীতাবলী, ১৮৮৭, পৃঃ ৫১-৫২)

**পরিশিষ্ট॥ ২॥**

**আখড়াই গান ঃ নিধুবাবু রচিত**

ভবানী বিষয়।।

ত্বমেকা ভুবনেশ্বরী, সদাশিবে শুভ করি।
নিরানন্দে আনন্দদায়িনী।১
নিশ্চিত ত্বং নিরাকারা অজ্ঞান বোধে সাকারা
তত্ত্বজ্ঞানে চৈতন্য রূপিণী।।২
প্রাণেতে প্রসন্নভাব, ভীমতর ভবার্ণব
ভয়ে ভীত ভবাম্বী ভবানী।
রূপাবলোকন করি, তরিবারে ভববারি,
পদতরি দেহি গো তারিণী।।৪

খেউড়।।

সাধের পীরিতি সুখে, দুখ পাছে হয়।১
তুমি হে চঞ্চল অতি, সদা এই ভয়।।২
গোপনে যতেক সুখ, প্রকাশে তত অসুখ,
ননদী দেখিলে পরে প্রণয় কি রয়।। ৩

প্রভাতী।।

যামিনী কামিনী বশ হয় কি কখন।১
হলে কিও বিধুমুখ, হেরি হে মলিন।।২
নলিনী হাসিবে কেন, কুমুদী বিরসানন

এ সুখে অসুখ তবে, করে কি অরুণ।৩

(সংবাদ প্রভাকর, ১ ভাদ্র, ১২৬১)

**পরিশিষ্ট॥ ৩॥**

**হাফ আখড়াই গীত**

বাগবাজারের দলের সখী সংবাদের প্রথম গীত।

মহড়া।

কৃষ্ণ কৃষ্ণময় হলো ব্রজের সকলে।
কৃষ্ণরূপ ভেবে কৃষ্ণরূপ, একি রূপ, অপরূপ, হয়ে যতনে কৃষ্ণপক্ষ,
দিবসে কৃষ্ণপক্ষ, কৃষ্ণ হে রাধায় কৃষ্ণ করিলে।।
এ সময় কোথায় রহিলে।
জিনি কমলিনী, ব্রজের কমলিনী।
আহা শ্রীমতী কিশোরীর, হইল কি শরীর, তারে করিলে
কালা, কালী কুরূপিণী।।
রাধা যেন রাধা নয়।
শ্রীরাধার সে আকার, নাহি আর, চেনা ভার, আহা তার,
হাহাকার প্রাণে নাহি সয়।।
শ্রীমুখ কমল ভাসে কমলে।

চিতেন।

কে সব কে শব দেখ, শ্যাম হে বিরহে তোমার।
সুখ বৃন্দাবন, শ্মশান সম, কৃষ্ণ হে সবাকার শবাকার।।
যেন শব সবে, সব সবে সবে।।
ভাবে ভাবিয়ে পরিণাম, করি হে হরিনাম দহে শুধু প্রাণ
মধুর কৃষ্ণ রবে রবে।।
তোমা বিনে গোকুলে।
প্রতিকুল, অনুকুল, শোকাকুল, উভয়কুল, গোপকুল,
গোপীকুল ভাসে অকুলে।।
হা কৃষ্ণ বলেও কাঁদে কুটিল।।

---

জোড়াসাঁকোর দলের প্রথম সখী সংবাদের উত্তর গীত।

মহড়া।

ওগো...য়ী শ্রীমতী তোমার ভাব দেখে হয়েছি বিস্ময়।
বাজার শ্যাম গুণধাম, তোমার নাম বাঁশিতে,
তুমি মন দিলে শ্যামের ঠাঁই, শ্যামের মন নিলে রাই
তার সনে তোমার বিচ্ছেদ বিচ্ছেদ নয়।।

চিতেন।

শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদ, খেদে, শোকাকুল।



গোপকুল, আর গোপীকুল, মিছে ভাবিয়ে আকুল।।
আমরা জানি শ্যামের মন, কৃষ্ণ ছাড়া নহে এই শ্রীবৃন্দাবন।
হলে কি জন্যে এত উচাটন।।
শ্যাম অঙ্গ, আর বাই অঙ্গ, আমরা জানি এক অঙ্গ, সে প্রেম হবে ভঙ্গ,
মনে নাহি লাগে।
মিছে ভাব অনুরাগে।।
প্রেম ডোরে বান্ধা কৃষ্ণ রসময়।

অন্তরা।

আমরা সঙ্গিনী তোমার।
তোমার সকল জানি কেন ভুলাও গো আর।
তুমি গোলকেশ্বরী মূলাধার।।
রাধাকৃষ্ণ দুটি নাম, নামের অগ্রে তোমার নাম,
এত মান দিয়াছেন, শ্যাম তোমায় ভালোবেসে।
সে ভাব অভাব ঘটিবে কি সে।।
এ ভাবে বিচ্ছেদ কে করে প্রত্যয়।

---

বাগবাজারের দলের সখীসংবাদের দ্বিতীয় অর্থাৎ পাল্টা গীত।

মহড়া।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম কোরে আমরা ত্যজি প্রাণ।
এ সময়, দীন দয়াময়, ধর রূপ মনোময়, ভবের ভরসা তুমি হরি,
তব রূপ ধ্যানে মরি, প্রাণান্তে পদপ্রান্তে, দিও স্থান।।
দেখা দেও করুণানিধান।
দুঃখে প্রাণে মরি, নাহি ভাবি হরি।
এই ভাবনা অন্তরে, কলহ সাগরে, পাছে ডুবে হে হরি, হরি নামের তরি।।
রাধা শ্যাম যুগল নাই।
রাধা শ্যাম যুগল নাম, মোক্ষধাম, তাহে বাম,
এখন শ্যাম জপি নাম, কুবুজা কানাই।।
দুই বাঁকায়ে কর সখা পরিত্রাণ।

---

চিতেন।

জীবনে জীবন ত্যজি, শ্যাম শ্যাম হে কৃষ্ণ প্রণয়ে।
ওহে নিদয় শ্যাম, সদয় হয়ে গোপিকার উদয় হও হৃদয়ে।।
কোথা প্রাণহরি, আমরা প্রাণহরি।
বাঁকা ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিঠাম, জন্মের শোধ হেরি শ্যাম, ভব জলধি তারি, দেহ পদতরি।।
প্রাণের আশা নাহি আর।
সবিশেষ সদা দ্বেষ, কৃপালেশ করে শেষ, হৃষীকেশ ব্রজের বেশ,
দেখাও একবার।।
কর আজ মরণ কালে চরণ দান।

জোড়াসাঁকোর দলের দ্বিতীয় সখী সংবাদের উত্তর গীত।

মহড়া।

তোমার বিচ্ছেদ জ্বালা রবে না, খেদে খেদে ত্যজ না ত্যজ না পরাণ।
ব্রজধাম, সুখধাম, নিত্যধাম জান না।
তোমার অবলা কুলবালা, হইওনা উত্তলা, সময়ে শ্রীচরণে পাবে স্থান।।

চিতেন।

জীবন ত্যজনা খেদে, মলে কি হবে।
দুদিন পরে পাবে প্রাণেশ্বর ব্রজে, প্রাণ জুড়াবে।।
থাকে বিচ্ছেদ যন্ত্রণা, মিছে আকুল হয়ে দুকূল হারাইও না,
পাবে ব্রজের ধনে ব্রজে, ভেবো না।
ধরা চূড়া পীতাম্বর। পোরে বাঁকা বংশীধর, নয়নেতে নটবর,
দেখিবে নিশ্চিন্তে।
যাবে যাবে বিচ্ছেদে চিন্তে।।
ব্রজেতে হবে শীতল তাপিত প্রাণ।

---

বাগবাজারের দলের খেউড়ের প্রথম গীত।

মহড়া।

কেন ওরে প্রাণ, প্রাণরে হয়েছে এমন।
কি ভাবেতে ঢল ঢল, কি রসেতে টলটল, তায়, খল খল হাস কি আভাষ,
ওরে প্রাণ প্রাণরে খল খল হাস, কি আভাষ
আবার ছল ছল দেখি দুনয়ন।

চিতেন।

এসেছি আশাতে পেয়ে দুখ।
সদয় হও, একবার কথা কও, প্রাণরে তুলে বিধুমুখ।।
হবে প্রেমযাগ, নবরাগ, অনুরাগ দেখি তার।
বল ধনি, কেন মুখের ধ্বনি হয়নাকো প্রচার।।
ক্ষুধিত অতিথি আমি বঞ্চিত কোরনা।
ওরে প্রাণরে প্রাণ আমার, বঞ্চিত কোরনা।।
আমায় প্রেম সুধা কর বিতরণ।

---

জোড়াসাঁকোর দলের খেউড়ের প্রথম গীতের উত্তর।

মহড়া।

মাগ বলে আমায়, একি দায়, সুপাদ গোছালে।
মস্ত বাম বাবজী হয়ে, আমারে চাও কর্ত্তে বিয়ে, তোমার সোহাগিণী বোন্
ফেলে।

চিতেন।

ঢল ঢল, টল টল, খল খল হাস।
ছল ছল, কেন চক্ষে জল, শুন তার আভাষ।।



ধোরে অতিথ বেশ এলে শেষ কর্ত্তে প্রেম যাগ।
মাথায় জটা, তার কপ্পী আঁটা তুলসীবনের বাগ।।
আমি মৌনবতী, নবীনে যুবতী, একি জ্বালা হোল, কথা কওয়ালে আজ
কোন ছলে।

---

বাগবাজারের দলের খেউড়ের দ্বিতীয় অর্থাৎ পাল্টা গীত।

মহড়া।

মৌনব্রত আজ প্রাণরে ভেঙে গেল প্রাণ।
মৌনবতী রসবতী, হাসিয়ে বলেছ পতি,
সাধের পীরিতি, যুবতী, ওরে প্রাণ, প্রাণের সাধের পীরিতি, যুবতী, আমায়
বরমালা তব করদান।

চিতেন।

বলনা ছলনা কেন আর।
বচনে, গেল এক্ষণে, প্রতিজ্ঞা তোমার।।
ডাকো পুরোহিত, কর হিত, সুবিহিত হবে যশ।
রব-বশে, তোমার নবরসে, করবো কত যশ।।
যতনে রাখিবো তোমায় হৃদয় নিবাসে,
ওরে প্রাণরে প্রাণ আমার হৃদয় নিবাসে।
যাবে প্রেম ক্ষুধা কোরে সুধা পান।

---

জোড়াসাঁকোর দলের খেউড়ের দ্বিতীয় অর্থাৎ পালটা গীতের উত্তর।

মহড়া।

তুম্বনাড়া রোগ, ভীষণ রোগ স্বভাব গেল না।
তিলক কুতলি ঝুলি ধরে, তুলসীতলায় বেড়াও ঘুরে, তোমার বোনমেগো
নাম ঘুচলোনা।।

চিতেন।

যা বল তা বল আমায় বেজার হব না।
এই আপশোষ, তোমার বোনের দোষ, দেখেও দেখ্‌লে না।
পেট্‌কো মুলুক চাঁদ, পেতে ফাঁদ, বোনকে কল্লে বশ।
জেলের হাঁড়ি, সেই কড়ে রাঁড়ি, জানে কত রস।।
বকাধার্ম্মিক হয়ে, রয়েছে বসিয়ে ঘরে মজা মেরে, তুমি ধর্ম্ম পানে
চাইলেনা।

সংবাদ প্রভাকর, ৮ অগ্রহায়ণ, ১২৬১;
২২ নভেম্বর, ১৮৫৪।

## কবিগান

ঈশ্বর গুপ্ত অনুমান করেছেন, আখড়াই গান ও কবিওয়ালার গান প্রায় একই কালে বাংলার সংস্কৃতি জগতে উদ্ভূত হয়েছে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে। কবি গুঁইয়ের আবির্ভাবকাল থেকে এর উৎপত্তি ধরে নিয়ে এই অনুমানের ভিত্তি। ৮৫৪ সালে গুপ্ত কবি লিখেছেন ১৪০ বছর আগে কবি গোঁজলা গুঁইয়ের আবির্ভাব ঘটে। তাঁর তিন সংগীত শিষ্যের নাম পাওয়া যায়। লালু-নন্দলাল, রঘুনাথ ও রামজী। ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছেন, সেযুগে কবি গোঁজলা গুঁই 'পেশাদারী দল করিয়া ধনীদিগের গৃহে গাহনা করিতেন।' সমাজে পেশাদারী গানের দলের চল থাকলে ধরেই নিতে হবে এই ধরনের সংগীতানুষ্ঠানের জনপ্রিয়তা যথেষ্ট না হলে পেশাদারী দলের প্রতিষ্ঠা হতে পারে না। অতএব অনুমান করে নেওয়া যায় যে গোঁজলা গুঁইয়েরও আগে সংগীত ও কলার জগতে কবিগান চালু ছিল, এবং কবিগান অনুষ্ঠানে প্রতিদ্বন্দ্বী কবির সঙ্গে গানের লড়াই করেই জয়পরাজয় নির্ধারিত হোত। গুপ্ত কবি খেদ করেছেন, কবি গোঁজলা গুঁইয়ের সঙ্গে গানের লড়াইয়ে যাঁরা নামতেন তিনি তাদের নাম জানেন না।

আদিকবি হিসাবে গোঁজলা গুঁইয়ের নামোল্লেখ সম্ভব হয়েছে তার শিষ্য প্রশিষ্যবর্গের কীর্তিকলাপে। গোঁজলা গুঁইয়ের শিষ্যবর্গের খ্যাতি নোতুন যুগের শহুরে সমাজে ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চটকদারী কলাচর্চা হিসাবে শহুরে সংস্কৃতি জয় করে নেয় কবিগান। সেদিন থেকেই কবিগান লিখিত ইতিহাসের অংশভাগী। এক একজন কবিকে ঘিরে কবিগানের পেশাদারী দল গড়ে ওঠে। মূলত শহুরে নববাবুরা কবিগানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কোলকাতা তখনো ভালোভাবে গড়ে ওঠেনি। কবিগানের আদি পাড়া স্থান হিসেবে পাওয়া যায় নবদ্বীপ, হুগলী-চুঁচুড়া, ফরাসডাঙা অঞ্চল।

গোঁজলা গুঁই থেকে যে ধারার দেখা মেলে তার বিষয়-বৈশিষ্ট্যে ছিল বৈষ্ণব গীতির প্রভাব। সরল বাংলায় লোকরঞ্জক বৈষ্ণবীয় প্রেমের গান লোক-মজানো ভংগিতে সহজ সুরে আসরে দাঁড়িয়ে গাওয়া হতো। কেউ কেউ বলেছেন ঐ ধারার জনক চৈতন্যশিষ্য হরিদাস ঠাকুর। তবে খেউড় গানের আদিরসের প্রভাব কবিগানের বিষয়-বিন্যাসে স্থান পেয়েছে এ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞেরা একমত। অতীন্দ্রিয় ও দেহদীন প্রেমের বিকাশ বলে আদৃত বৈষ্ণবীয় সাহিত্যধারার লোক-মজানো দিক খেউড়ের সহায়তা নিয়ে কবিগানে আশ্রয় পেয়েছে। বৈষ্ণবীয় প্রেমবৈচিত্র্যের তলানী আর খেউড়ের আদিরস—এই দুই নিয়ে কবিগান। খেউড়ের সংমিশ্রণ যথেচ্ছভাবেই ঘটেছে কবিগানের বিষয় বিন্যাসে। বৈষ্ণবদের আখড়াই এদের জন্ম-সম্ভাবনা ধরে নিয়ে আখড়াই গানের অন্যতম ইতিহাসকার গঙ্গাকিশোর বলেছেন,"তাহারা অর্থের প্রলোভনে পড়িয়া যদিও কথঞ্চিৎ পরিবর্তিতাকারে সম্পূর্ণ নিয়ম ও ভাবসম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে সক্ষম থাকিল বটে কিন্তু ব্যবসায়ের মধ্যে আনিয়া সেই মহনীয় আখড়াই সঙ্গীত সংগ্রামকে কবির লড়াই করিয়া ফেলে।" গঙ্গাকিশোর কথিত ঐ যুগের আখড়াই সংগ্রাম পরবর্তীকালের নদীয়া, চুঁচুড়া, কোলকাতার আখড়াই গান নয়। এ গান সম্পূর্ণত বৈষ্ণবদের আখড়ায় গাওয়া সবটাই কৃষ্ণপ্রেমের বিষয়-বিন্যাসে আদৃত। ঐ গান নিয়েই পক্ষ-প্রতিপক্ষের প্রতিযোগিতা হোত বিভিন্ন আখড়ায়। ভারতকোষে বলা হয়েছে,"সম্ভবত জনপ্রিয়তার ফলে খেউড় ও কবিগান সমার্থক হইয়া পড়িয়াছিল।"

ডক্টর সুশীলকুমার দে তাঁর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কবিগানের তিনটে স্পষ্ট যুগ-বিভাগ করেছেন। আঠারো শতকের প্রথম দশক থেকে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ, ১৭৬০ থেকে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ এবং ১৮৩০ থেকে পরবর্তীকাল। প্রথম পর্ব গঠন যুগ, দ্বিতীয় পর্ব ঐশ্বর্যের যুগ, তৃতীয় পর্ব অন্তিম যুগ।



ইতিহাসের সাক্ষ্যে মোটামুটি দেড়শো বছর ধরে কবিগানের পোষকতা হয়েছে বঙ্গদেশে। কৃষ্ণের প্রণয়লীলা থেকে বিষয়-বৈশিষ্ট্যের ঐতিহ্য সংগ্রহ করে কবিগান ক্রমশ স্থূল থেকে স্থূলতর রুচির আশ্রয় নিয়েছে। কবিগানের সৃষ্টি আকস্মিক নয়। বৈষ্ণব পদাবলীর লালিত্য ভেঙে, বর্জিত অতীন্দ্রিয়তার স্পর্শ এড়িয়ে আদিরসাত্মক সাহিত্য ও সংগীতধারা কবিগানে প্রবেশ করেছে। মনে রাখা দরকার কবিওয়ালাদের মধ্যে অনেকেই শুধু সমাজের নিম্নবর্গের মানুষ নন, তাদের স্থূলরুচির দুটি কারণ; এক, অশিক্ষিতপটুত্ব; দুই, স্থবির সমাজের নিম্নগামী রুচির অপ্রতিহত প্রভাব ও চাহিদা।

চৈতন্যধর্মের পূর্বেও রাধাকৃষ্ণের জনপ্রিয় কাহিনী লৌকিক সংস্কৃতিতে স্থান পেয়ে আসছিল বিশেষ এক মানসিক অনুষঙ্গ হিসেবে। এমনকি পরবর্তী যুগে কবিওয়ালাদের মূল বিষয়-ঐশ্বর্য বৈষ্ণবীয় প্রেমের চর্চা বলে স্বীকার করে নিলেও তাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যাঁকে বৈষ্ণব-সাধক বলে চিহ্নিত করা যাবে, যেমন বৈষ্ণব কবিদের অনেকেই ছিলেন। শুধু তাই নয় তারা সকলেই সাধনায় জ্ঞানে সামাজিক প্রতিষ্ঠাও আদায় করে নিয়েছিলেন। চৈতন্য-পূর্ব যুগেই 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের চলন। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন থেকেই কবিগানের সৃষ্টি হয়েছিল বলে অনুমান করেন। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' ও 'চাপান ও উতোরের মতো উক্তি প্রত্যুক্তি দেখা যায়।' তবে এও স্বীকার্য নয় যে চৈতন্যধর্মের বিশেষ রুচির বৈভবে রাধাকৃষ্ণের প্রণয় কাহিনী উঁচু মার্গের ভাববাদী দার্শনিক কল্পনার প্রতীকে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু নিম্নরুচির আকর্ষণে ঐ একই বিষয়বস্তু কবিগানে স্থূল ও চটুল রুচিবিকারে নেমে এসেছিল। দুটি সংস্কৃতি অব্যাহত ধারায় পাশাপাশি চলে এসেছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন,"আমাদের দেশের কবিরা আদিরসের গান লিখতে গেলেই রাধাকৃষ্ণের দোহাই দিতেন। নিজের মনের ভাব ছল করিয়া রাধাকৃষ্ণের ঘাড়ে চাপাইয়া দিতেন...। বৈষ্ণবীয় ধর্ম চিরকালই আদিরসের উৎস। চৈতন্যধর্মের প্রাণবন্ত ঐতিহ্য যখন আঠারো শতকে সজীবতা হারালো তখনই রাধাকৃষ্ণের লীলার আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্য চটুল রুচিবিকারের আশ্রয় নিতে বাধা পায় নি, কেন না এই ঐতিহ্য চৈতন্যধর্মের আগে থেকেই দেশে বিদ্যমান ছিল। আঠারো শতক থেকেই কবিগানের সংস্কৃতি লৌকিক কৃষ্টিচর্চার প্রধান আসন নিতে থাকে। চৈতন্য পরবর্তী যুগে খেউড় গান নিয়ে সংগীত-লড়াই সে যুগে রাজা-জমিদারদের পোষকতা পেয়েছে। খেউড়ের চাপান-উতোর ও বিষয়বস্তুর আদিরস প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করেছে কবিগানকে। এই প্রসঙ্গে কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ ঝুমুর ও ধামালী গানের প্রভাবের কথা বলেছেন। তবে মূল বিষয়বস্তুতে এবং গানের আঙ্গিকে বৈষ্ণবীয় প্রেমসংগীতের আরও প্রত্যক্ষ প্রভাব এসে পড়লেও এর চটুল উদ্দীপনা ও রুচিবিকৃতির ধার সরাসরি খেউড় গান থেকেই উদ্ভূত।

আদি কবি হিসাবে কবেগানের প্রথম পেশাদারী দল পরিচালক বলে ঈশ্বর গুপ্ত উল্লেখ করেছেন গোঁজলা গুঁইয়ের নাম—আঠারো শতকের প্রথম দশকে তার আবির্ভাব। তাঁর তিন শিষ্য, রঘুনাথ, লালু-নন্দলাল ও রামজী দাস। রঘুর শিষ্য হরুঠাকুর। রামজীর শিষ্য ভবানী বেনে। লালু-নন্দলালের শিষ্য নিতে বৈষ্ণব। শেষোক্ত কবিওয়ালাদের সময়কাল আঠারো শতকের শেষ ও উনিশ শতকের প্রারম্ভকাল। ঐ সময়ে আরো একজন কবিওয়ালাও বিশিষ্টতা অর্জন করেন। তিনি কৃষ্ণ নামক একজন চর্মকার, যাহাকে সাধারণে কেষ্টা মুচি নামে উল্লেখ করিত। সেই ব্যক্তি কবিতা রচনা দ্বারা অত্যন্ত বিখ্যাত হইয়াছিল। সম্ভ্রান্ত লোকেরা অতিশয় সমাদরপূর্বক তাহার গান শ্রবণ করিতেন। বড় বড় ওস্তাদি দলের লোকেরা তাহার নিকট গান লইয়া তদ্দ্বারা লোকের মনোরঞ্জন করিত। ঐ মুচি হরু ঠাকুরকে অনেকবার পরাজয় করিয়াছে।

কবিয়াল রঘুনাথের জীবনকাল আনুমানিক ১৭২৫ খ্রী. থেকে ১৭৯০ খ্রী.। ইনি গোঁজলা

গুইয়ের শিষ্য বলে পরিচিত। রঘু কবিকে দাঁড়াকবির সৃষ্টিকর্তা বলে অনুমান করা হয়। এঁরই শিষ্য হরু ও রাসু-নৃসিংহ। রঘুনাথের নিবাস ছিল চুঁচুড়ায়। ইনি জাতিতে তাঁতি বলে উল্লেখ আছে।

লালু-নন্দলালের সময়কাল অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যযাম। একজন গবেষক উল্লেখ করেছেন ইনি রাসু ও নৃসিংহ দুই কবি ভ্রাতার সমসাময়িক। রাসু নৃসিংহের জন্মকাল আঠারো শতকের তিরিশের দশক। মৃত্যুর সময় উনিশ শতকের প্রথম দশক। লালু-নন্দলাল একজন কবি না দুজন কবি এ নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। আচার্য সুনীতিকুমার লালচন্দ্র ও নন্দলাল নামে দুই কবির ভণিতাযুক্ত একটি গানের উল্লেখ করেছেন। গানটি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। ঈশ্বরগুপ্তের উল্লেখ অনুযায়ী জানা যায় তাঁহার সময়ের ৮০ বছর আগে লালু-নন্দলালের সময়কাল অর্থাৎ ১৭৬০—৭০ সাল লালু-নন্দলালের গৌরবময় যুগ।

গৌজলা গুইয়ের অন্যতম শিষ্য রামজী দাস। রামজীর শিষ্যদের মধ্যে খ্যাতি পেয়েছিলেন নিতাই দাস বৈরাগী, ভবানী বেনে, রাম বস প্রমুখ। এরা তিনজনই তাঁদের কালে বাংলাদেশে সেরা কবিয়াল রূপে খ্যাত হয়েছিলেন। প্রথম জীবনে নিজ দল গড়ার আগে রামজীর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করতে পরেন নি। রামজীর কাছ থেকে এঁরা গান লিখিয়ে নিতেন। গানের পদ রচনায় রামজীর কৃতিত্ব কবিমহলে সুবিদিত ছিল।

লালু-নন্দলালের সমসাময়িক আর একজন অনন্য-সাধারণ ক্ষমতাবান স্বভাবকবি কেষ্টা মুচি। এ পর্যন্ত তাঁর একটি মাত্র গানের সন্ধান মিলেছে। সম্ভবত সমাজের একেবারে নিম্নতম শ্রেণী থেকে উদ্ভূত বলেই বোধ হয় তাঁর গানের পদ রক্ষিত হয় নি। আরো কারন এই, সম্ভবত কেষ্টা মুচির কোনো শিষ্য প্রশিষ্য ছিল না যারা গুরুর গানের সম্পদ রক্ষা করতে সচেষ্ট হবে। প্রয়োজনমত আসরে গাইবে। শুধু গান নয়, কেষ্টা মুচি সম্পর্কে আর বিশেষ কিছু জানা যায় না। প্রবাদ আছে 'কবির গুরু হরু ঠাকুর'—এই হরু ঠাকুর নাকি অনেকবারই কেষ্টা মুচির কাছে পরাস্ত হয়েছেন, ঈশ্বরচন্দ্র তা উল্লেখ করেছেন।

কেষ্টা মুচির মতো সামাজিক নিম্নশ্রেণীর একাধিক মানুষ বাংলার স্বভাবকবি হিসাবে কবিগানে অংশ নিয়েছেন, তৎকালীন বাংলার সংস্কৃতি জগতে নাম কিনছেন, শ্রোতা-দর্শকদের হাততালি কুড়িয়েছেন। এমন আর একজন হলেন, নিমে শুঁড়ি। তাঁরও কোনো গানের নিদর্শন আজও পাওয়া যায়নি কিন্তু জনমনে তাঁর নামের স্মৃতি হারিয়ে যায়নি। ঈশ্বর গুপ্তের অনুসন্ধানে যা পাওয়া গিয়েছে তাতে তিনি শুধু জানাচ্ছেন,'নিমে শুঁড়ি একজন গণনীয় কবি।'

রাসু-নৃসিংহ দুই কবিভ্রাতা। কায়স্থ বংশজাত। এদের নাম একসঙ্গেই উচ্চারিত হয়। চন্দননগর-ফরাসডাঙা অঞ্চলের অধিবাসী। ১৮৫৫ সালের সংবাদ প্রভাকরে গুপ্তকবি বলেছেন, তাঁর ঐ কাল থেকে পঞ্চাশ বছর আগে রাসুর জীবনকাল। সময়টা ১৭৩৫-১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দ। রাসুর দু-বছর বাদে নৃসিংহের জন্ম। রাসুর মৃত্যুর পরেও নৃসিংহ বেঁচেছিলেন। কবিগানের স্বর্ণযুগে দুই ভাই একই দলে থেকে গান গেয়ে বিখ্যাত হয়েছিলেন।

কবির গুরু হরু ঠাকুরের জীবনকাল ১৭৪৯-১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দ। পুরো নাম হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গি। কবিদলের মধ্যে একমাত্র বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। পিতা কল্যাণচন্দ্র দীর্ঘাঙ্গি কলকাতার সিমুলিয়া অঞ্চলের অধিবাসী। উচ্চ বংশজাত হলেও তাঁর উচ্চশিক্ষা বিশেষ ছিল না বলেই জানা যায়। সংস্কৃত অথবা ইংরেজি কোন ভাষাতেই পাঠ নেননি। হরু ঠাকুর প্রথম জীবনে কবিওয়ালা রঘুনাথ দাসের সান্নিধ্য লাভ করেন। পরে ব্যক্তিগত উদ্যোগে সখের দল গড়েছিলেন। শেষে রাজা নবকৃষ্ণের আগ্রহে ও পোষকতায় পেশাদারী দলের প্রতিষ্ঠা দিলেন। হরু ঠাকুর খেউড় গানে নিপুণ ছিলেন। অশ্লীলতার কারণে ঈশ্বর গুপ্ত সেগুলি লিপিবদ্ধ করে রাখেন নি। হরু ঠাকুরের শিষ্যদের



মধ্যে খ্যাত হয়েছিলেন, ভবানী বণিক, নীলু ঠাকুর, ভোলা ময়রা। এঁরা প্রত্যেকেই নিজের দল গড়ার আগে হরু ঠাকুরের সাগরেদি করেছেন। হরু ঠাকুরের দলে সমবেত সংগীতে গলা মেলাতেন। জানা যায়, হরু ঠাকুর এদের দলের জন্যও গান লিখে দিতেন।

নিতে বৈরাগীর পুরো নাম নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী। জন্ম ১৭৫১ সালে চন্দননগরে। হরু ঠাকুরের চেয়ে বয়সে ছোটো কিন্তু কবিওয়ালা রাম বসুর থেকে অনেক বড়। নিতাই বৈরাগী গান রচনার চেয়ে কণ্ঠমাধুর্যের জন্য বিখ্যাত হয়েছিলেন। নিতাই বৈরাগী খেউড়গানের জন্যও বিখ্যাত হয়েছিলেন। কোন পাঠশালায় নিতে বৈরাগীর শিক্ষা হয় নি, তবে লেখাপড়া যৎকিঞ্চিৎ শিখেছিলেন পিতার কাছে। চুঁচুড়ায় আবার ছিল কিন্তু মহারাজ নবকৃষ্ণের পৃষ্ঠপোষকতাও পেয়েছিলেন। কোলকাতাকে ঘিরে ইংরেজদের যে ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে, ভাটপাড়া, কাঁচরাপাড়া, ত্রিবেণী, বালী, ফরাসডাঙা, চুঁচুড়া প্রভৃতি অঞ্চলে নিতাই গানের আসর পেয়েছেন। নিতাই-এর খেউড় গানের জনপ্রিয়তার কথায় ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছেন বিরহ বা সখী সংবাদ জাতীয় গানের পর নিতাইকে আসরে খেউড় গাইতে হতো শ্রোতাদের দাবীতে। নিতাই বৈরাগী আর ভবানী বণিকদের গানের লড়াই সে যুগে বিখ্যাত হয়েছিল।

কবিওয়ালা বলহরি রায় বীরভূম অঞ্চলের অধিবাসী। জাতিতে রাজপুত। জন্ম, ১৭৪৩-৪৪ খ্রীষ্টাব্দ; মৃত্যু ১৮৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দ। বীরভূম অঞ্চলে বিখ্যাত ছিলেন। বীরভূমে প্রচলিত ছিল বলহরি রায় নাকি কবিগানের আদিপুরুষ। কেউ কেউ বলেন বলহরি লালু-নন্দলালের শিষ্য।

বীরভূম জেলায় আর এক স্বভাবকবি কৈলাস বারুই। জন্ম ১২০৫ সাল, মৃত্যু ১২৮০ সাল। বয়সে বলহরি রায়ের চেয়ে কিছু ছোটো। কিন্তু বীরভূম অঞ্চলে একই আসরে দুজনের কবির লড়াইয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। কৈলাসচন্দ্রের সঙ্গে নিতাই বৈরাগী ও পরবর্তীকালের সৃষ্টিধর ঠাকুর কবিওয়ালার লড়াইয়ের কথা জানা যায়।

সৃষ্টিধর ঠাকুর বিখ্যাত হয়েছিলেন ছিরু ঠাকুর নামে বীরভূম জেলায়। জন্ম বৈদ্য বংশে। পণ্ডিত, শাস্ত্রবিদ্ এবং গান রচয়িতা হিসাবে খ্যাতি পেয়েছিলেন। ছিরু ঠাকুর সম্পর্কে উল্লেখ আছে, 'ছিরু যদি গান লিখিতেন, বলহরি সুর দিতেন এবং সে গান যদি কৈলাসচন্দ্র গাহিতেন তবে তাহার তুলনা মিলিত না।'

গৌর কবিরাজ গান রচয়িতা হিসেবেই বিশেষ খ্যাতি পেয়েছিলেন। নিবাস ছিল কোলকাতার সিমুলিয়া অঞ্চলে। খেউড় রচনায় এঁর পারদর্শিতা ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র লিখেছেন, 'গৌর কবিরাজ বিরহ ও খেউড় গান যেমন উত্তমরূপে রচনা করিতে পারিতেন অন্য গান তত উত্তম করিয়া রচিতে পারিতেন না। নিতাই দাস বৈরাগীর দলের জন্য তিনি অনেক গান লিখে দিয়েছিলেন বলে ঈশ্বর গুপ্ত উল্লেখ করেছেন। আরও একাধিক কবিওয়ালা গৌর কবিরাজের গান গেয়ে দল রেখেছেন।

কোলকাতার বরানগরে জন্মেছেন ভবানী, বাস করেছেন জোড়াসাঁকোয়, জাতিতে গন্ধবণিক। ভবানে বেনে নামে লোকসমাজে সুপরিচিত ছিলেন। উনিশ শতকের প্রথমদিকেই ভবানে বেনের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। হরু ঠাকুরের দলে কবিজীবনের সূত্রপাত। সেখানেই প্রথম জীবন সমবেত গানে গলা মেলাতেন। পরে নিজের দল গড়েন। হরু ঠাকুরের রচিত গানও ইনি যেমন নিয়েছেন তেমনি রামজী দাসের কবিগানও আসরে গেয়েছেন। কবি-ওয়ালা রাম বসু প্রথম জীবনে ভবানে বেনের দলভুক্ত হয়ে গান লিখে দিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র উল্লেখ করেছেন, এককালে তিন সেরা কবিয়ালের অন্যতম ছিলেন ভবানী বণিক। অন্য দুজন হরু ঠাকুর ও নিতাই বৈরাগী।

রাম বসুর জন্মকাল ১১৯৩ সাল, অর্থাৎ ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দ। কুলীন কায়স্থ। বাল্যকাল কেটেছে আত্মীয়দের বাড়িতে কোলকাতার জোড়াসাঁকো অঞ্চলে। জন্ম, হাওড়ার শালিখা অঞ্চলে। কথিত

আছে, পাঠশালায় যখন পড়তেন পাঁচ বছর বয়সেই বালক রাম বসু পাঠশালায় কলার পাতায় ছড়া লিখতেন। আঠারো শতক যখন শুরু হয় সেই সময় ভবানী বেনের দল খুব নাম করেছে। ভবানী কবিয়াল জোড়াসাঁকোর পথ দিয়ে যেতে যেতে একদিন কয়েকটি গান কুড়িয়ে পান। খোঁজ নিয়ে জানলেন বারো বছরের বালক রাম বসুর লেখা। সন্ধান করে তিনি সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ করেন। কিশোর বালকেরই লেখা গান সেদিন থেকে ভবানী বেনে নিতে শুরু করলেন। এর সম্পর্কে ঈশ্বরচন্দ্র লিখেছেন, 'যেমন সংস্কৃত কবিতায় কালিদাস, বাঙ্গলা কবিতায় রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র, সেইরূপ কবিওয়ালাদিগের কবিতায় রাম বসু।' বালক রাম বসুর গান নিয়ে ভবানী বেনে উপকৃত হয়েছিলেন, একথা ঈশ্বর গুপ্ত স্বীকার করেছেন।

রাম বসু তাঁর পূর্ববর্তী কবিওয়ালাদের মতো স্বল্পশিক্ষিত ছিলেন না। ইংরেজি শিখে প্রথম জীবনে কেরানীগিরি করেছিলেন। পরে এই জীবিকা ছেড়ে দিয়ে গান লিখে উপার্জনের পথে নামলেন। 'সর্বাগ্রে ভবানী বেনেকে, পরে নীলু ঠাকুর, তৎপরে মোহন সরকার সর্ব্বশেষ ঠাকুর দাস সিংহের দলে গান দিতেন। ঠাকুরদাস সিংহের জীবিতবস্থাতেই তিনি স্বয়ং দল করিয়া বসেন। সেই দল রাম বসুর দল নামে ঘোষিত হওয়াতেই বসুজ বঙ্গদেশের সর্ব্বস্থানে আহূত ও সমাদৃত হইয়াছিলেন। মোটে ৪২ বছর জীবিত ছিলেন। ১৮২৭ কিংবা ১৮২৮ সালে রাম বসুর মৃত্যু হয়।

রাম বসুর থেকে বয়সে বড়ো নীলু ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন সম্ভবত ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে, মৃত্যু ৬০ বছর বয়সে, ১৮২৫ সালে। পুরো নাম নীলমণি ঠাকুর, কলকাতার সিমলা অঞ্চলে বাস ছিল। নীলু ঠাকুরও এক সময়ে রাম বসুর থেকে গান নিয়ে আসরে গাইতেন। নীলু ঠাকুর আরও অনেকের কাছ থেকেই গান নিতেন, কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য, গদাধর মুখোপাধ্যায়, গৌর কবিরাজ— এঁরাও নীলু ঠাকুরকে গান লিখে দিয়েছেন। প্রথম জীবনে তিনি হরু ঠাকুরের দলে ছিলেন। নীলু ঠাকুরের ভাই রামপ্রসাদ তাঁর দলে সহযোগী ছিলেন। তাঁর দলের খ্যাতি হয়েছিল। ওস্তাদি দল বলে। অনুজ রামপ্রসাদও অগ্রজের জন্য গান লিখে দিতেন।

ভোলা ময়রার জন্মসাল ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দ। সম্পূর্ণ নাম ভোলানাথ দাস। জাতিতে মোদক, হুগলী জেলার লোক। ভোলার পিতা বাগবাজারে মিষ্টির দোকান খোলেন। গ্রামের পাঠশালায় ভোলানাথ সামান্য লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। লেখাপড়া বলতে বাংলা আর সামান্য হিসেবনিকেশ হরু ঠাকুর ছিলেন ভোলার গুরু। কবিগানে ভোলার খ্যাতি ছিল প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে—উত্তর-প্রত্যুত্তরের চটকদারীত্বে। অল্প বয়সে হরু ঠাকুরের দলে গানে গলা মেলাতেন। হরুর প্রিয় শিষ্য ছিলেন ভোলানাথ। রাজা নবকৃষ্ণের মৃত্যুর পর হরু ঠাকুর যখন দল তুলে দিলেন ভোলা ময়রা নিজের দল গড়লেন। ভোলার যুগে আরো কিছু শক্তিমান কবিওয়ালা ছিলেন যাঁদের সঙ্গে ভোলা ময়রার কবির লড়াই কিংবদন্তী পর্যায়ে রয়ে গেছে। এঁদের মধ্যে বিখ্যাত হলেন এন্টনি ফিরিঙ্গি। এ-ছাড়াও ভোলার প্রতিবন্দী হিসাবে নাম কিনেছিলেন ঘাটাল মহকুমার কবিয়াল যজ্ঞেশ্বর ধোবা। বলাই সরকার, হোসেন শেখ এঁরাও ভোলা ময়রার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে নাম কেনেন। সারা বঙ্গদেশেই ভোলার গতিবিধি ছিল। হরু ঠাকুর ও ভোলানাথ সম্পর্কে সেকালে একটি প্রচলিত ছড়া ছিল ঃ

ভোলা যদি ধরে বোল    তিনু নুটো ধরে ঢোল
আসরে বসিয়া যদি হরু দেন কোল
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর    সবে হন অগ্রসর
নিস্তব্ধ হইয়া যায় মানুষের গোল ॥

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও নাকি ভোলা ময়রার গুণমুগ্ধ ছিলেন।



এন্টনি কবিয়ালের পুরো নাম হেন্সমান এন্টনি, পোর্তুগীজ সন্তান। লোক মুখে এন্টনি ফিরিঙ্গি নামে খ্যাত হয়েছেন। এন্টনির নিবাস ছিল গোঁদল পাড়ায়। শোনা যায় ব্রাহ্মণী পত্নীর (সৌদামিনী) প্রভাবে বাঙালী হিন্দু মতে জীবনযাপন করতেন, বিলক্ষণ বাংলাও শিখে নিয়েছিলেন। জীবনে বাংলার যাত্রা ও কবিগানে খুবই আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। পরে নিজেই কবির দল গড়ে গোরক্ষনাথ যোগী নামে এক স্বভাবকবিকে মাসিক ২০ টাকা বেতনে নিজের দলের গানের বাঁধনদার নিযুক্ত করেন। এই থেকেই শুরু। তার পরেই এন্টনি নিজেই স্বভাবকবির মতো গান বাঁধায় দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। রাম বসু যখন ঠাকুরদাস সিংহের দলে গান করতেন তখন থেকেই এন্টনি কবির লড়াইয়ে নাম কিনেছিলেন। রাম বসু, ভোলা ময়রা, রামসুন্দর কর্মকার, ঠাকুরদাস সিংহ প্রমুখ কবিদের সঙ্গে এন্টনির কবির লড়াই বিখ্যাত হয়ে আছে। রঙ্গরসে এন্টনির সঙ্গে ভোলা ময়রার বাকযুদ্ধ এখনো কিংবদন্তী হিসেবে চালু। তবে যে যুগে কবিগানে অশ্লীলতা ও ইতরতার অজস্র নমুনা পাওয়া যেত। সে যুগেই এন্টনি তার ছড়ায় গানে অন্যদের চেয়ে বেশি সংযত বাক্য ব্যবহার করেছেন।

ঠাকরে সিংহ নামে জনসমাজে আদৃত এই কবিওয়ালার পুরোনাম ঠাকুরদাস সিংহ। তিনি ছিলেন রাম বসু, হরু ঠাকুর প্রভৃতি কবিওয়ালা গায়কদের সমসাময়িক।

এন্টনি কবিওয়ালার মতো জন হ্যালহেড ছিলেন আরেক বিদেশী সন্তান, যিনি কবিগানের রসে মজেছিলেন। বাংলা ভাষায় প্রথম ব্যাকরণ রচয়িতা ন্যাথানিয়েল ব্রাসলি হ্যালহেডের ভাতুষ্পুত্র ছিলেন তিনি। জন হ্যালহেড উচ্চ শিক্ষা পেয়েছিলেন। বর্ধমানের রাজসভায় তাঁর কবিগানের আসরের উল্লেখ আছে।

কবিগানের লৌকিক চাহিদায় বাংলাদেশে আরো বহু স্বভাবকবির নাম, কবিতাংশ এবং কবিযুদ্ধের খবর পাওয়া যায় সেকালের সংবাদপত্রগুলিতে। ছন্দোবদ্ধ বাক্‌যুদ্ধে এদের বাচালতা, উপস্থিত বুদ্ধির প্রকাশ, খেউড় ও কুৎসা সেকালের মানুষকে অনন্যোপায় হয়ে টানতো কারণ মূল সামাজিক রুচির পরিচ্ছন্নতা তখনও নানা কারণে ব্যাপক অর্থে বিস্তারলাভ করে নি। এমনকি কয়েকজন মহিলা কবির নামও পাওয়া যায়, যেমন— যজ্ঞেশ্বরী দেবী, কবিয়াল কামিনী। এ ছাড়াও কবিওয়ালার জগতে পুরুষ কবিদের মধ্যে উনিশ শতকের মধ্যযাম পর্যন্ত যাঁরা খ্যাতি পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন, নবাই ঠাকুর নীলমণি পাটনি, যজ্ঞেশ্বর ধোবা, রামসুন্দর কর্মকার, গদাধর মুখোপাধ্যায়, রামানন্দ নন্দী, গোরক্ষনাথ যোগী, ঠাকুরদাস চক্রবর্তী, সাতু রায়, নবাই ময়রা, বলাই বৈষ্ণব, মহেশ কাণা, মোহন কাণা, মোহন সরকার, মধুসূদন সিংহ, হোসেন শেখ প্রমুখেরা।

* * *

কবিগানে গানের আঙ্গিকের একটা ব্যাপার ছিল, গানের পর্যায় বিভাগও ছিল। কবিগানের প্রথম গান মালসী, বা ভবানী বিষয়ক, তারপর সখী সংবাদ তারপর খেউড় ও শেষে প্রভাতী। কবিগানের যেসব পদ্যাংশে বিভিন্ন কবিদের নামোল্লেখে পাওয়া যায় তার সবকটিই প্রায় মালসী আর সখী সংবাদের অংশ। দুর্ভাগ্যবশত খেউড়ের অংশগুলি রক্ষিত হয়নি। সম্ভবত রুচিহীন বাক্য বিন্যাস থাকায় এগুলি লিখিত আকারে পাওয়া যায় না। কবিগানের লিখিত ইতিহাসে এ পর্যন্ত মালসী বা সখী সংবাদের আলোচনায় কবিগানের তাৎপর্য ও কবিদের শক্তিমানতার বিশ্লেষণ হয়েছে। আসরে যথেষ্ট অঙ্গভঙ্গি সহকারে গানগুলি গাওয়া হোত। অনেক সময় খেউড়ের সঙ্গে অঙ্গভঙ্গিও কদর্যর স্তরে নেমে যেত।

কবিওয়ালাদের মধ্যে অধিকাংশ স্বভাবকবির শিক্ষাগত যোগ্যতা যেমন ছিল না তেমনি

পারিবারিক-সামাজিক রুচির পরিচ্ছন্ন স্তর থেকে মানসিক বিকাশ তাদের ঘটে নি। সেকালে তা সম্ভবও ছিল না। তৎকালীন সমাজবিচারের মানদণ্ডে নিচুতলায় যেসব মানুষ স্বভাবকবি হিসাবে খ্যাতি পেয়েছিলেন তাঁদের কটাক্ষ না করেও বলা চলে আঠারো শতকে বাংলার সমাজ পরিবেশে এমনিতেই রুচিবিকৃতির প্রাবল্য অস্বীকার করা যেত না। কবির জগতে তথাকথিত সমাজের উঁচুতলা থেকে যাঁরা এসেছিলেন রুচিবৈভবে তাঁদের দীনতাও লক্ষণীয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা, তখন অভাবিত দুর্যোগের মেঘে ভারাক্রান্ত। যে সমাজ পরিবেশে সাহিত্য-সংস্কৃতি গড়ে ওঠে তার পরিবেশ যথেষ্ট অনুদার ছিল সুস্থ সংস্কৃতি পরিবেশনের ক্ষেত্রে। অপর্যাপ্ত রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলা, বিপর্যস্ত আর্থিক ব্যবস্থা, পড়ন্ত সামন্ততান্ত্রিক শাসন, শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্মের অনাচার ও চটুল পরিবেশ এক বৃহৎ সামাজিক অবক্ষয়ের সূচনা করে। পূর্ব ও পশ্চিম বাংলায় বর্গীর হাঙ্গামা, জলপথে পোর্তুগীজ ও মগদস্যুদের উৎপাত, সুযোগ-সন্ধানী বিদেশী বণিকদের লোলুপ বাহুবিস্তার, বাংলার সাধারণ মানুষের জীবন দুর্গতির ক্রমপ্রবাহে ভারাক্রান্ত করে আনে। এক দীর্ঘ সামাজিক অবক্ষয়ের সূচনা সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ থেকে গোটা অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত পরিব্যাপ্তি ছিল। ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদকে এই দীর্ঘ অবক্ষয়ী যুগের দুই কৃতী পুরুষ বলে স্মরণ করা যেতে পারে। তাও যুগপ্রভাবে ভারতচন্দ্রের কাব্যে বিদ্যাসুন্দরের মালিন্য ও ক্লেদাক্ত সামাজিক সংস্কৃতির অপরিচ্ছন্ন প্রভাব এড়াতে পারেনি। এই পরিবেশেই লৌকিক সংস্কৃতিচর্চায় কবিগানের প্রসার ঘটল।

সংস্কৃতির মূল্যায়নে যখন পরিশীলিত রসোপলব্ধি ও ভাবের গভীরভাব সঙ্গে উন্নত সমাজমনস্কতা স্থান পায় না, মূল্যায়ন নির্ধারিত হয় বাকচাতুর্যে ও চটুলভাবের তাৎক্ষণিক প্রয়োগে তখন সংস্কৃতির আবেদন নির্ধারিত করতে হয় হার-জিতের প্রসঙ্গ এনে। কবিগানের প্রাসঙ্গিক মূল্যায়ন রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'সাহিত্য রসের সৃষ্টি নয় ক্ষণিক উত্তেজনার উদ্রেক।' কবিগানের উত্তর-প্রত্যুত্তরে অতি নীচু মানের গালাগালির স্রোত অফুরন্ত ছিল, যেমন কবিয়াল নীলু ঠাকুরের ভাই রমাপ্রসাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কবিয়াল রাম বসু তাঁকে ''রাত ভিখিরির ধামা বওয়া'' বলে গালাগালি দিতে কুণ্ঠিত হন নি। ইঙ্গিতটি হল বারনারীর আড়কাঠি। প্রতিদ্বন্দ্বীকে ইতর ভাষায় আক্রমণ করে অপদস্থ করার মধ্যে যে জিত, কবিগানের মধ্যে সেটাই ছিল গণনীয়। মহিলা কবি যজ্ঞেশ্বরীকে উদ্দেশ্য করে ভোলা ময়রা বলেছিলেন, 'তুমি আমার গাভীমাতা চল... ধরাতে যাই'; অতি নীচু স্তরের ইঙ্গিত। যেমন, রাম বসুর আরেকটি উক্তি, 'মাগের কাছে পেগের বড়াই'। অশ্লীল ও কুৎসিত ভাষায় অশোভন ঘটনার উল্লেখ— এ-সব ছিল কবিগানে উত্তেজনার খোরাক যোগাবার মালমশলা।

কবিগানে খেউড়-প্রসঙ্গ ছাড়াও সখী সংবাদ বা বিরহ সংগীতে যেভাবে রসের উপস্থাপনা করা হত তা অনেক ক্ষেত্রেই শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে যেত। বৈষ্ণবীয় প্রেমমাধুর্যের ঐতিহ্য নিয়ে গর্ব করার সুযোগ কবিগানের খুবই কম। রাম বসুর মতো তৎকালীন শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত কবিয়াল সখী সংবাদে গেয়ে ওঠেন ঃ

ভাল শুভ ক্ষণে তাতে আমাতে
এক রজনী দেখা সই
তারপর আমিই বা কে, সেই বা কে
কর্মে পাওয়া গেল কই।

শেষের চরণে ইঙ্গিতটি কীসের? রবীন্দ্রনাথের সমালোচনায় বর্ণিত 'ইতর ভাষা ও শিথিল ছন্দ'— এই অভিধা থেকে কবিগানের মুক্তি নেই।



ঈশ্বর গুপ্তের ভাষায় 'যিনি কবিওয়ালাদের মধ্যে একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ', সেই রাম বসুর রচনা থেকে উদ্ধৃতি তুলে ধরা যায়। রাম বসুর এক গানে সখী সংবাদে নব যুবতী ষোড়শী বিরহিণীর কান্নার ভাষায় হাহাকারে বলা হয়েছে ঃ

আমার এ ধনের সম্ভোগী যে জন
কল্লো না রক্ষে, সঁপে-বিপক্ষে
আগুলে বেড়াই পরের ধন॥
রেখে একেলা অবলারে বিরহ বাসরে
করে সে পরের সঙ্গে সহবাস।

এই গানের বিস্তৃত ব্যাখার প্রয়োজন নেই— অশালীন ভাব, ইতর ভাষা, শিথিল ছন্দ কোনোটাই মহৎ সংস্কৃতিমন্যতার পরিচায়ক নয়, কেবল যৌন আবেদন অপরিচ্ছন্ন উত্তেজনা সৃষ্টি করা ছাড়া।

ধর্মের ভাবধারাকেও ন্যক্কার ও অশ্লীলরূপে ভজনা করার প্রবৃত্তি থেকে চটুল উপায়ে সহজে অপরিণত শ্রোতা সমাজকে মুগ্ধ করা যেতে পারত। যেমন রাসু-নৃসিংহের গানে শ্রীকৃষ্ণকে উল্লেখ করে রাধিকা বলেছেন,

শ্যাম আপনারো অঙ্গ যেমন ত্রিভঙ্গ
কালিয় ভুজঙ্গ কুটিলে
কুবুজারো অঙ্গ রসেরো তরঙ্গ
তাহাতে শ্রী অঙ্গ ডুবালে।

হরি আর হর অভেদাত্মা। কবিগানে এই এক অদ্ভুত দেবতার উল্লেখ কীভাবে লোক-মজানো সংস্কৃতিতে স্থান পেয়ে যায় তার উদাহরণ,

হায় যে যেমন ভোলা, তাহাতে উজ্জ্বলা
গলে অস্থিমালা ছড়াতে
মুখে কৃষ্ণনাম, শিঙ্গায় বলে রাম
বিশ্রাম কুচনী পাড়াতে।

গান শুনতে গিয়ে কানে আঙুল দিতে পারবেন না। দেবতা বারনারীদের পাড়ায় গিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন এমন সব উল্লেখ মাধুর্যে উনিশ শতকী কবিসংস্কৃতি উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

## সমাজরুচির বিবর্তন প্রসঙ্গ

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে বাংলার সংস্কৃতি জগতে কৃষ্টিকলার দিক পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছিল, খেউড় কবিগান ও আখড়াই গানে। মঙ্গল কাব্যের যুগ প্রায় শেষ হয়ে এল। যদিও তখনো মঙ্গলকাব্য রচনার চেষ্টা একেবারেই শেষ হয়ে যায় নি তবে মঙ্গলকাব্যের সমাদরের যুগ শেষ হতে চলেছে। মঙ্গলকাব্য রচনায় এ যুগের দুই সেরা প্রতিনিধি ভারতচন্দ্র (১৭০৬-১৭৬০) ও রামপ্রসাদ (১৭২০-১৭৮১)। ভারতচন্দ্র লিখেছিলেন অন্নদা মঙ্গলকাব্য, তার অংশবিশেষ ছিল বিদ্যাসুন্দর কাব্য (১৭৫২)। বিদ্যাসুন্দর কাব্যের আখ্যায়িকা কালিকামঙ্গলের উপাখ্যান। ভারতচন্দ্রের আগেও এর কাহিনি নিয়ে কাব্য রচিত হয়েছে। ভারতচন্দ্রের কয়েক বছর পরেই কালীসাধক

রামপ্রসাদও লিখেছিলেন বিদ্যাসুন্দর কাব্য (১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দ)।

ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর রুচিবিকারের দোষে অখ্যাত। বিদ্যাসাগরমশাই যখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত ছিলেন তখন তাঁকে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর পড়াতে হোত। বিদ্যাসাগরের প্রিয়পাত্র কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য লিখছেন, বিদ্যাসুন্দরের খেউড় অংশ পড়াবার সময়ে তিনি অত্যন্ত 'লজ্জিত ও কুণ্ঠিত' হয়ে পড়তেন। একথা বিদ্যাসাগরমশাই স্বমুখে তাঁকে জানিয়েছিলেন। বিদ্যাসুন্দর কাব্য কবিত্বগুণে নয় রুচিহীনতার কারণে বাজার মাত করে দেয়। শৃঙ্গার রসের আধিক্যে তার জনপ্রিয়তা। সে সময়ে নদীয়ায় মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রত্যক্ষ প্রেরণায় খেউড় সংস্কৃতির সাধনা চলেছে। মহারাজাই উৎসাহ দিয়েছিলেন ভারতচন্দ্রকে বিদ্যাসুন্দরের মতো আদিরপ্রধান কাব্য লিখতে।

অন্নদামঙ্গলের অন্নদা ভারতচন্দ্রের কুলদেবী। প্রথমে তার মহিমা ঘিরেই কাব্য রচনা করার অনুরোধ করেন কৃষ্ণচন্দ্র। রচনা শেষ হলে বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যানও এই সঙ্গে জুড়ে দিতে কৃষ্ণচন্দ্র আদেশ দিলেন। এর আর একটা কারণও ছিল। বিদ্যাসুন্দর কাব্যে বর্ধমান রাজপরিবারকে অশালীন ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে রাখবার চেষ্টাও ছিল বলে অনুমিত হয়। এটি কৃষ্ণচন্দ্রের যেমন কাম্য ছিল তেমনি ভারতচন্দ্রেও মনোমত হয়েছিল। অর্থ ও কুলকৌলীন্যজনিত ঈর্ষা কৃষ্ণচন্দ্রের কম ছিল না। আর ভারতচন্দ্র বর্ধমান রাজার অত্যাচারে একদা উৎপীড়িত হয়েছিলেন, সর্বস্বান্ত হয়ে কারারুদ্ধও হয়েছিলেন। ভারচন্দ্রের আগে যে কালিকামঙ্গল উপাখ্যান প্রচলিত ছিল সেসবে কোথাও বর্ধমানের উল্লেখ নেই। এটি ভারতচন্দ্রের আমদানী। নিছক আদিরস আর খেউড়প্রধান বিষয়টি সাহিত্যগুণের চমকদারিতে তুলে আনার চেষ্টায় ভারতচন্দ্র সফল হয়েছিলেন।

খেউড়-আখড়াই-কবিগান যুগের রমরমা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮৫৮) লিখছেন, 'নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র রায়, সুচতুর ও সুপণ্ডিত ছিলেন, ও তাঁহার নিকটে গুণিগণের প্রচুর সমাদর ছিল, কিন্তু লাম্পট্য দোষে তাঁহার সে গুণ গরিমা কলুষিত হইয়াছিল। বঙ্গভাষায় শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্র তাঁহার প্রসাদে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহারই কুপ্রবৃত্তির প্রভাবে বিদ্যাসুন্দরে অশ্লীলতার আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন...তাঁহারই উৎসাহে খেউড়ের বাহুল্য সন্দেহ নাই...ভারতচন্দ্র বারমাস বর্ণনে তাহার সম্যক প্রাণ দিয়াছেন। ঐ খেউড় ও কবি যে কি জঘন্য ছিল, তাহা সভ্যতার রক্ষা করিয়া বর্ণন করা দুষ্কর।' রাজা-মহারাজাদের প্রত্যক্ষ প্রেরণায় সে যুগে খেউড় সংস্কৃতির বহুল প্রচার ও জনপ্রিতায় উত্তরণ ঘটে।

খেউড়ের বিষয়গৌরবে আখড়াই গানও পরিপুষ্ট। কবিগানে আরও প্রত্যক্ষভাবে রুচিহীন সংস্কৃতি পুষ্টি লাভ করে। বৈষ্ণবীয় বিষয়-বৈভব ধার করলেও কবিগানে তার যথার্থ মাধুর্য লুপ্ত হয়েছে। সুশীলকুমার দে'র ভাষায় ঃ It must be noted that the latter (songs of Kabiwallas) in many cases debased and vulgarised while they borrowed the ideas and conception of Baisnamb poetry. এই প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উক্তি আরও প্রণিধানযোগ্য ঃ 'আমাদের দেশের কবিরা আদিরসের কাব্য লিখতে গেলেই রাধাকৃষ্ণের দোহাই দিতেন। নিজের মনের ভাব ছল করিয়া রাধাকৃষ্ণের ঘাড়ে চাপাইয়া দিতেন। পাঁচালীওয়ালারাও এই কাজ করিতেন, কবিওয়ালাও করিতেন। তরজাওয়ালারাও অনেক সময়ে করিতেন। ফলে যা ঘটল তা হোল, সমাজ রুচিসম্পদে ও যথার্থ শিক্ষার প্রসার লাভে বঞ্চিত ব্যক্তিরা কবিগানের স্রষ্টা হয়ে আসর মাত করতে এগিয়ে এলেন। অত্যন্ত শিথিল আদর্শের ছড়াছড়ি কবিগানকে অপসংস্কৃতির গভীরে নিয়ে গেছে।

বৈষ্ণব পদাবলীর আদর্শকে আঁকড়ে ধরে কবিগান সংস্কৃতির বৈতরণী পেরোবার উদ্যোগ নিয়েছিল। পরাশ্রিত লতার মতন শাল বৃক্ষকে জড়িয়ে ধরে আকাশে ওঠার চেষ্টা। বৈষ্ণব আদর্শ আঁকড়ে ধরে কবিকল্পনার দীন চেষ্টা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে বৈষ্ণব কবিদের পদাবলীর মধ্যে এমন অংশ আছে যাহা নির্মল নহে, কিন্তু সমগ্রের মধ্যে তাহা এক প্রকার শোভা পাইয়া গিয়াছে। কবিওয়ালা সেইটিকে তাহার সজীব আশ্রয় হইতে, তাহার সৌন্দর্য পরিবেষ্টন হইতে, বিচ্ছিন্ন করিয়া ইতর ভাষাও শিথিল ছন্দ-সহযোগে স্বতন্ত্র ভাবে আমাদের সম্মুখে ধরিলে তাহা গলিত পদার্থের ন্যায় কদর্য মূর্তি ধারণ করে।'

* * *

সংস্কৃতি চর্চার নামে এই আবিলতার স্রোত অপসংস্কৃতির চর্চা—এর সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতও ছিল। মুর্শীদকুলী খাঁর রাজ্যশাসন ব্যবস্থায় গড়ে তোলা সরকারি রাজস্ব ও আর্থিক সংগঠনে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার দায় থেকে সমাজ যেমন মুক্তি পায় নি—সংস্কৃতিও মুক্ত হয় নি। তখন ধর্মকে আশ্রয় করে লোক মজানোর অপচেষ্টাই ছিল প্রবল। যেমন বৈষ্ণব কাব্য-গীতির শৃঙ্গার রসের তলানিটুকু আখড়াই গানে স্থান পেয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত স্মার্ত ও শাক্ত সংস্কৃতির প্রভাবও আখড়াই গানে এসে গেছে। বৈষ্ণব পদাবলীর ধর্মাশ্রিত অতীন্দ্রিয়তায় উত্তরণের চেষ্টাও আখড়াই গানে থাকলো না। আখড়াই গানের শুরুতে বৈষ্ণবীয় রসের পাশাপাশি ভবানী বিষয়ক প্রসঙ্গ আনা হয়েছিল, আসলে, তা সমকালীন রুচি ও ভাবধারার ঐতিহ্যকে স্বীকার করে নেওয়া।

কবিগান ও আখড়াই গান, দুটি সঙ্গীতধারাই ধর্মের প্রবল বাঁধন থেকে সংস্কৃতি কলার বেরিয়ে আসার চেষ্টা, কিন্তু এই চেষ্টা কোন উন্নতির রুচির তাগিদে হয় নি। নবাবের দেওয়ান ও মুন্সীরা যে-মুন্সীরা যে সংস্কৃতির চর্চায় উৎসাহ দিয়েছেন তা শুরু থেকেই ছিল বিকৃত রুচির ভজনা। তা সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা নয়। সেটি রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'হঠাৎ রাজার সভায় উপযুক্ত গান হইল কবির দলের গান।' সেই হঠাৎ রাজার সভার উপযোগী সংস্কৃতির অন্যতম সেরা নমুনা ছিল ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মনোরঞ্জনের জন্যেই লেখা নবাবীযুগের দেওয়ান মুন্সীদের হাত থেকে বঙ্গ-সংস্কৃতির নায়ক পরবর্তী যুগের ইংরেজ বণিকের প্রসাদ-পুষ্ট দেওয়ান-বেনিয়ানদের করায়ত্ত হলেও রুচির নিম্নগামিতা আরও গভীরে গিয়ে পৌছলো। এগিয়ে এলেন, শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ, জোড়াসাঁকোর সিংহ পরিবার, চিৎপুরের মল্লিক পরিবার, বাগবাজারের বসু পরিবার, পাথুরিঘাটার ঠাকুর পরিবার—এঁরা সবাই ইংরেজ বণিকের প্রসাদে নবযুগের ধনী। বিদেশী বণিকের দেওয়ান, মুৎসুদ্দি, বেনিয়ান কিংবা তাদের বংশধর।

মধ্য যুগে সংস্কৃতির চর্চা ছিল ধর্মের টানে। এ যুগে নিছক আনন্দ উল্লাসে তার পরিসমাপ্তি ও রুচি বিকৃতি। মধ্যযুগে সংস্কৃতি-চর্চায় রুচি-বিচারের প্রসঙ্গ ছিল না—ছিল ধর্ম প্রসঙ্গে ভীতি আর বিস্ময়, ধর্মাচরণের প্রেরণা। ফলে কাব্যাদর্শে রীতি, আচার ও বিষয়বস্তুর পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। এ যুগে বিকৃত উল্লাসের ছড়াছড়ি, শৃঙ্গার রসজাত বিকৃতির পৌনপুনিকতা। সে যুগে যাঁরা মঙ্গলকাব্য লিখেছেন তাঁরা সকলেই ছিলেন শিক্ষিত ও ধর্মীয় রুচিতে আস্থাবান—এ যুগে সংস্কৃতির স্রষ্টাদের অধিকাংশই অশিক্ষিত পটুত্বের অধিকারী, জনচিত্তজয়ের তাৎক্ষণিক রীতিতে আস্থাবান।

নবযুগের অর্থকৌলীন্যজাত রুচিবিকারের প্রবাহ সমকালীন সমাজের পটভূমিকায় স্বাভাবিক ছিল। তৎকালীন সমাজের মূল ধারাটিকে তা সহজেই ধরে নিতে পেরেছিল। এসম্পর্কে নববাবুবিলাস গ্রন্থে প্রকাশিত সে যুগের ছড়া-ই বলছে ঃ

মনিয়া বুল বুল আখড়াই গান
খোষ পোষাকী যশমী দান
আড়ি ঘুড়ী কানন ভোজন
এই নবধা বাবুর লক্ষণ।

নববাবু হতে গেলে সে যুগে অনেক কিছুর সঙ্গে কবিগান ও আখড়াই গানের পোষকতা করতে হোত। সেকালের অত্যন্ত প্রচলিত এই ছড়া সেকালের সংবাদপত্রেও পাঠান্তরে প্রকাশিত হয়েছিল। এর থেকে বুঝতে পারা যায়, তৎকালীন সমাজে বাবুদের পরিচিতি কী কী উপাদানে গড়া। 'নববাবুবিলাস' গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে।

তারও আগে ১৮২ খৃষ্টাব্দে (২৪ ফেব্রুয়ারি) প্রকাশিত সমাচার দর্পণেও তির্যক ব্যঙ্গে 'বাবুর উপাখ্যানে' বলা হচ্ছে : 'বাটীতে টিকটিকির নাচ ও ভেকের গান ইত্যাদি মাঙ্গলিক কর্ম্ম' হিসাবেই দেখা হোত। ইঙ্গিতটি পরিষ্কার, নিছক ব্যঙ্গই নয়—বাইনাচ আর কবি-আখড়াই গানের কথাই বলা হচ্ছে। আঠারো শতকের নবাবী আমল থেকে অর্থ-কৌলীন্যে হঠাৎ বড়োলোক বাবুদের বিকৃত রুচির প্রসাদে শুরু হয়ে গেল আদিরস ও শৃঙ্গার রসের সংস্কৃতি চর্চা।

আখড়াই ও কবিগানের বাহুল্য প্রচারের সঙ্গে বংগীয় সমাজে আরও বিবিধ গানের চর্চাও ছিল যা কোন রকমেরই রুচি আভিজাত্যে উন্নত সংস্কৃতির পরিচয় দেয় না। কবি ও আখড়াই গানের রুচিবিকারের সঙ্গে এ সব গানের সমধর্মিতা ছিল। নববাবুদের মনোরঞ্জনেই এ সব গানের উদ্ভব ও সমাজস্বীকৃতি ঘটে, যেমন বাইয়ানা গীত, নেড়ীর গান (কীর্তনাংগ গীত), পীরের গান, বিরহ-খেউড়, যাত্রার গান, ঢপ গান।

কীর্তন থেকে ঢপ গানের জন্ম। ঢপ গানের প্রবর্তক হিসেবে 'মধু কান'-এর নাম খ্যাত। আসল নাম মধুসূদন কিন্নর। কীর্তন গানের উন্নত সুর সম্পদ ঢপ গানে নেই—নেই বিশুদ্ধ রাগ-রাগিণীর ঋজুতা। ঢপ গানকে প্রভাবিত করেছে কবিগানের গায়নরীতি ও চটকদারিত্ব। বলা চলে কবিগানের প্রভাব এবং পশ্চাৎপট মধু কানের লঘু সংগীত রীতির প্রেরণা। ঢপ গানের বিষয়বস্তুতে রাধাকৃষ্ণের প্রেমবর্ণনাই মুখ্য স্থান নিয়েছিল। নববাবুরা এসব গানের চর্চার আসর রুদ্ধদ্বার বৈঠকখানা ঘরে বসাতেন না। আমোদ আহ্লাদের ছিটেফোঁটা সাধারণ মানুষেও পেত। পালাপার্বণে কবি ও আখড়াই গানের আসর বসানো অতি আবশ্যকীয় ব্যাপার ছিল। ১৮২৩ সালে লেখা বই, 'কলিকাতা কমলালয়ে' ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন, 'দেখ এস্থানে যে সকল লোক দুর্গোৎসব করেন, তাহাকে ঝাড় উৎসব, বাতি উৎসব, কবি উৎসব, বাই উৎসব কিম্বা স্ত্রীর গহনা উৎসব ও বস্ত্রোৎসব বলিলেও বলা যায়।' উৎসবের আয়োজন হলেই ঝাড় লণ্ঠন, বাইনাচ, স্ত্রীর নোতুন গয়না-গাঁটির সঙ্গে কবি আখড়াই গানের আসর অবশ্যম্ভাবী ছিল। নদীয়া চুচুড়া থেকে আসা মাত্রই কোলকাতায় কবি-আখড়াই চর্চা শহরের বিকৃত পরিবেশে রুচি দৈন্যের সংগে খাপ খেয়ে যায়। নববাবুদের খোলা আসরে হাজার হাজার জনসমাগম খুবই সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াত। নববাবুদের রুচিবিকৃতি শহর সমাজে চারিয়ে গিয়েছিল সহজেই।

রাজনারায়ণ বসু লিখছেন, 'এক দিবস ও দুই দিবসের পথ হইতেও লোক সকল নিতে-ভবানের লড়াইগুলিতে আসিত। যাদের বাটিতে বাজনা হইত তাঁহার গৃহে লোকারণ্য হইত। ভিড়ের মধ্যে ভেদ করিয়া প্রবেশ করিতে হইলে প্রাণান্ত হইত। তৎকালে যদিও অন্যান্য দল ছিল, কিন্তু হরু ঠাকুর, নিতাই দাস এবং ভবানী বণিক এই তিন জনের দল সর্বাপেক্ষা প্রধান রূপে গণ্য ছিল। কুমারহট্ট, ভাটপাড়া, ত্রিবেণী, বালী, ফরাশডাঙা, চুঁচুড়া প্রভৃতি নিকটস্থ ও দূরস্থ সমস্ত গ্রামের ভদ্র ও অভদ্রলোক নিতাইয়ের নামে ভাবে গদ গদ হইতেন। যেসব অঞ্চলের নামোল্লেখ হল সেসব অঞ্চলে ইংরেজ বণিকের বাণিজ্যকেন্দ্র তখনই গড়ে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে নগরকেন্দ্রিক উঞ্ছ সংস্কৃতি চর্চাও ঐসব অঞ্চলে প্রবল হয়ে ওঠে।

ইংরেজ বণিকের উঞ্ছ বৃত্তির সহায়ক হয়ে সমাজের শীর্ষে বসে কদর্য সংস্কৃতি স্রোতে যাঁরা নগরকেন্দ্রিক সমাজ ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তাদের ধরন-ধারণের ছবি সেকালের সংবাদপত্রে যে



ভাবে আঁকা হয়েছিল সেটি তাদের সামগ্রিক সংস্কৃতি চর্চার অনুরূপ :

'বাবুদের নটবরবেশ, গলায় দোনরি, তেনরি, পাঁচনরি হার, বাহুতে সোনার কবচ, কোমরে সোনার চাবির শিকলি, কালাপেড়ে, রাঙাপেড়ে, শালপেড়ে, কাঁকড়াপেড়ে ধুতি, বিদ্যা গোটাকতক বিলাতী অক্ষর লিখিতে শিখেন আর ইংরেজি কথা দুই তিনশত শিখেন, নোটের নাম লোট, গার্ডের নাম বেনিগারদ, লৌরি সাহেবকে নৌরিসাহেব এই প্রকার ইংরেজি শিখিয়া সর্ব্বদাই গোটেহল, ডোনকের ইত্যাদি বাক্য ব্যবহার করা আছে আর বাঙ্গসাভাষা প্রায় বলেন না এবং বাঙ্গালী পত্রও লিখেন না, সকলকেই ইংরেজি চিঠি লিখেন তাহার অর্থ তাহারাই বুঝেন...।'

এই সব ভাগ্যবান ব্যক্তিদের সংস্কৃতি চর্চার আর এক দিক ছিল বাইজীপোষা। সেকালের সংবাদপত্রেও এদের খবর সাড়ম্বরে প্রকাশ পেত। হাজার দু'হাজার টাকা মাসোহারা দিয়ে ভাগ্যবান ব্যক্তিরা নর্তকী পুষতেন। কয়েকজন বিখ্যাত নর্তকী কোলকাতার বাবুসমাজ আলোকিত করে রেখেছিল, এঁরা হলেন নিকীবাই, বেগমজান, হিংগুলবাই, আশরুন, জিনৎ, ফৈজ বক্স, নান্নিজান, সুপনজান। প্রকাশ্যে নর্তকী পোষা নিয়ে কোলকাতা শহরে তখন রীতিমত প্রতিযোগিতাই ছিল। পুজো, বিয়ে, শ্রাদ্ধ কোন ব্যাপারেই 'টিকটিকির নাচ আর ভেকের গান' বাদ পড়তো না।

১৮১৫ সালে পুজোর সময়ে বিলেতের 'এসিয়াটিক জার্নালে' এ সম্পর্কে বাবুদের নাম দিয়ে নাচ গান ও মদ্যপানের অফুরন্ত স্রোতের খবর বেরোয়। বাহুল্যের ঘটায় সেদিন যাঁরা সংবাদপত্রের খবর হয়ে ওঠেন তাঁরা হলেন নবকৃষ্ণপুত্র রাজা রাজকৃষ্ণ, রাজা রামচন্দ্র, বাবু নীলমণি মল্লিক, গোপীমোহন ঠাকুর, নবকৃষ্ণের দত্তক পুত্র গোপীমোহন দেব, বদ্রুনাথ বাবু, মধুসূদন সান্যাল, রূপচাঁদ বাবু। এঁরা প্রত্যেকেই ইংরেজ বণিকের দেওয়ান, বেনিয়ান বা তাদের বংশধর।

* * *

কত বিচিত্র ভাবে সেকালে সংস্কৃতিচর্চা হোত তার এক উদাহরণ হল শহরের পথে সঙ নিয়ে শোভাযাত্রা। এখানেও চুঁচুড়ার অগ্রবর্তী ভূমিকা। অশ্লীল সামাজিক রুচি-বিকার-সহ সঙ-প্রতিযোগিতা শুরু হয় চুঁচুড়ায়। পরে তার কোলকাতায় বাজার মাত। এমনকি ১৮২৩ সালে দ্বারকানাথের বাগানবাড়িতে ভাঁড়েদের সঙ-এর বাহার বাবুদের মনোরঞ্জনের জন্যই বাদ যায় নি। কোলকাতায় সঙ শোভাযাত্রায় চূড়ান্ত অশ্লীলতার খবরও পাওয়া যায়। নোতুন সভ্যতার সেরা নগরী কোলকাতা। সঙ বাহারে কোলকাতার বাবুদের হারাবে কে? এক সরস্বতী পুজোর ভাসানের দিনে সঙ বেরুল শহরের রাস্তায়। এই সঙের মধ্যে ছিল, 'মনুষ্যাকার পুত্তলিকা নির্মাণ করাইয়া তাহাকে বিবস্ত্র করিয়া শোভাযাত্রা।' খবরে প্রকাশ, সঙের মূল উদ্যোক্তাকে সেদিনে পুলিসে ধরে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। বিচারে সাহেব বলেন, 'তুমি তোমারদিগের দেবতার সম্মুখে এ প্রকার কদর্য্যাকার সঙ করিয়াছ এ অতি মন্দ কর্ম্ম ইত্যাদি কথায় অনেক তর্ক্ক করিয়া শেষ ৫০ পঞ্চাশ টাকা দণ্ড করিয়াছেন।''

যে সামাজিক অনাচার থেকে এ ধরনের বিকৃত রুচিপ্রবাহ জন্ম নেয় বাংলাদেশে সেই অনাচারের স্রোত অনেক দিন থেকেই সমাজে চলে আসছিল। কুলশীল মানে যারা সমাজে উচুবর্ণে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তাঁদের প্রসাদেই সামাজিক ব্যাভিচার অফুরন্ত স্রোতের ঢেউয়ে সমাজ ভাসিয়ে রেখেছিল। সেই ষোড়শ শতক থেকেই সামন্ততান্ত্রিক সমাজের অপশাসন, অবিরাম শোষণ, শাস্ত্র ও ধর্মের বজ্রআটুনির পশ্চাতে ভ্রষ্টাচার, সমাজবন্ধনের নামে সামাজিক, পারিবারিক দোষের তালিকা বৃদ্ধি,—সবকিছুই এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে যা শেষ পর্যন্ত সামাজিক কদর্যতা ও আবিলতার স্রোত বজায় রাখে। সামাজিক ভাঙনের ইতিহাসও তা তৈরি করে। হিন্দু দেবদেবীকেও সামাজিক ভ্রষ্টাচারের কল্পনায় নামিয়ে আনা অসম্ভব ব্যাপার ছিল না সে যুগে।

ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দীর মঙ্গল কাব্যগুলিতে এর ভূরি ভূরি উদাহরণ পাওয়া যাবে। যেমন বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলে খেয়াপাটনি ডোমনী নারীকে প্রেম নিবেদন করেন দেবাদিদেব শিব ঃ

আমার মনে লয়, যদি তোমার মনে রোচে।
তোমার সঙ্গে গৃহবাসে মনের দুঃখ ঘোচে।।
কার্তিকের মাতা ঘরে আছে মহামায়া।
তাহা হইতে তোমারে অধিক করিব দয়া।।

শিবের আচরণ দেখে কুপিত মহামায়া সিবকে গালি পাড়েন ঃ

পরদার লোভে তুমি জাতি কর নাশ।।
মদন আনন্দে তোমার বুদ্ধি হইল ক্ষে।
খাইলা ডোমের অন্ন তোরে ছোঁবে কে।।

এই ধরনের সামাজিক শিথিলতা ও ভ্রষ্টাচার সমাজসংস্কৃতির প্রধান ধারাটি চিনিয়ে দেয়। এর থেকেই বোঝা যায় সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীর কালে বাঙালী জীবনে সমাজবিকৃতি কোন্ স্তরে ছিল। সে যুগের সামাজিক কুলগ্রন্থগুলিতে সামাজিক পারিবারিক ভ্রষ্টাচারের অজস্র কাহিনী লিপিবদ্ধ রয়েছে। বাংলার কুলীন সমাজে স্বেচ্ছাচার ও ব্যাভিচারের ঢেউ সাহিত্য সংস্কৃতি ও কাব্য কলায় এসে আঘাত দেবে এতে আর বিচিত্র কি? উনিশ শতকের এই ভ্রষ্টারের প্রবাহ বাঙালী জীবনে অটুট ছিল। পরন্তু, নবাবী আমলের দেওয়ান মুন্সী আর পরবর্তীকালের ইংরেজ বণিকের বেনিয়ান মুৎসুদ্দিরা প্রত্যক্ষভাবেই এই সামাজিক রুচিহীনতাকে সযত্নে প্রতিপালন করে গেছে। সমাজে মধ্যবিত্তের স্তরেও প্রবাহমান অনাচার, বহু বিবাহ, বাল্য বিবাহ, সতীদাহ ঘটিত ঘটনাগুলিতে প্রতিফলিত হয়েছে। যেখানে সামাজিক রুচি পঞ্চাশের অধিক স্ত্রী সংগ্রহে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না সেখানে সংস্কৃতিচর্চা অপসংস্কৃতি স্তরে থাকবে না এমন হতে পারে না।

যবন সংসর্গে যাদের জাত যেত সেই ব্রাহ্মণেরা ঘটকের কাজে অর্থলোভে জাত মারা ব্যবসায়ে পেছপা ছিল না। বিয়ের কাজে মেয়ে কেনাবেচা থেকে ব্রাহ্মণ ঘটকদের অপরিমিত লোভের খবর সংবাদপত্রেই পাওয়া যায়। 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকায় প্রকাশ, বিভিন্ন জাতের মেয়েদের ব্রাহ্মণ কন্যা বলে চালিয়ে দিয়ে অর্থোপার্জন বিশেষ শক্ত ছিল না। প্রথমত ব্রহ্মার সন্তান মিথ্যাচার করতে পারে— এই বিশ্বাস মনে স্থান দেওয়ায় পাপ ছিল। আর ব্রাহ্মণ ঘটকেরাই ব্রাহ্মণ পাত্রের কাছে টাকা নিয়ে এই অনাচারে লিপ্ত থাকত। এমনকি দরিদ্র মুসলমান কন্যা কিনে নিয়ে দূর গ্রামে ও শহরে ব্রাহ্মণ কন্যা হিসাবে চালিয়ে দিয়ে বিয়ে দেওয়ার খবর পরে চাপা থাকে না। কলকাতার সমাজে এই তথাকথিত শাস্ত্রবিরুদ্ধ অনাচারের বাহুল্য জ্ঞাতসারে করা হত। প্রকাশ্য সমাজে এ সব ভ্রষ্টাচার বলে গণ্য করে গোপনে অর্থোপার্জনের উপায় হিসেবে নেওয়া হত।

বহুবিবাহ বা বাল্যবিবাহের যত অনাচার কুলীন অকুলীনের উপার্জন জীবিকা নির্বাহের হাতিয়ার ছিল। এই সব ঘটনা সবই সামাজিক ভাঙনের ছবি তুলে ধরে। পড়ন্ত সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাজাত নিদারুণ দারিদ্র্য, রুচিবিচার, মানসিক বৈকল্য প্রধান সামাজিক স্রোতে পরিণত হয়। ১৮৩৬ সালের জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকায় ২৭ জন জীবিত কুলীন ব্রাহ্মণের খবর প্রকাশ পেয়েছে, যারা বহুবিবাহকারীদের মধ্যে অন্যতম। এদের মধ্যে অন্তত দুজন আছে যারা পঞ্চাশের বেশি স্ত্রী সংগ্রহ করেছে। রাষ্ট্রিক ও সামাজিক অপশাসনে সমাজের ভাঙন যখন বিপুল আকার নেয় সেই কালে জীবিকা সন্ধানী মানুষদের বহু রকম ফিকিরের আশ্রয় নিতে হয়। ১৮৩১ সালে সম্বাদ কৌমুদী পত্রিকায় প্রকাশিত এক মহিলার বিষণ্ণ পত্রাঘাত সমাজ-আচারের বীভৎস দিক তুলে ধরেছে।

মহিলা পিতৃপরিচয় দিয়ে চিঠি লিখে জানাচ্ছেন যে, তাঁর পিতা 'বাল্যকালাবধি প্রায় চল্লিশ সংসার করিয়া থাকিবেন তাহার নিজ বাসগৃহ থাকে নাই, মাতামহ গৃহে জন্ম হইয়াছিল পরে শ্বশুরের ভবনে ও পথ পর্যটনে কাল গত হইয়াছে কোন শ্বশুর গৃহে চারি পাঁচ বৎসর পরে দুই তিন দিনের নিমিত্ত যাইতেন কোন স্থানে বা দশবৎসরের মধ্যে একবার গমনেও মহাত্যক্ত হইতেন আমার মাতামহ গৃহ হইতে পিতার জন্মভূমি প্রায় দুইশত ক্রোশ অন্তর হইবেক...আমার মাতামহ তাহাকে দেশ হইতে আনিয়া আমার মাতার সহিত এবং আমার আর চারি মাতৃসহোদরার সহ বিবাহ দিয়াছিলেন শুনি যে তাহার পর এদেশে একবার আগমন করিবাতে মাতার ও দুই মাতৃস্বসার এক ২ কন্যা হইয়াছিল আমরা যখন দশবৎসর বয়স্ক হইলাম সেকাল পর্য্যন্ত পিতা অথবা বিমাতাপুত্র কোন তত্ত্ব করিতেন না।'

এই পিতা পরে লোকজন এনে মহিলার মাতার গোপনে এক অপরিচিত পাত্রের সঙ্গে ঐ কন্যার বিয়ে দেন। তারপর থেকেই বিবাহিত পাত্র সেই নববধূ ত্যাগ করে অন্যত্র চলে গেলেন, মহিলা দুঃখে জানাচ্ছেন, 'সেই অবধি প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রম হইল পতির সহিত দর্শন নাই বর্ত্তমান আছেন কিনা জানিনা তাহাও জ্ঞাত নহি কেবল মাতুলের ভবনে কখন পাচিকা কখন বা দাসীরূপে কাল যাপন করিতেছি।'

১৮৩১ সালে এই মহিলার বয়স পঞ্চাশ; অতএব জন্মকাল ১৭৮০-৮১, বিবাহ ১৭৯০-৯১। কলকাতায় তখন রাজা নবকৃষ্ণের পৃষ্ঠপোষকতায় খেউড়, আখড়াই, কবিগানের জমজমাটি আসর। জনরুচিকে নিম্নস্তরে নামিয়ে আনার সফল ভজনা চলছে। সামাজিক পরিস্থিতি সাড়ম্বরে তৎকালীন মূল সংস্কৃতি চর্চার ভ্রষ্ট চরিত্র রক্ষা করেছে।

সংস্কৃতিচর্চায় এই অনাচার বাংলাদেশে প্রথম মুদ্রণের ইতিহাসেও স্থান পেয়েছে। ১৮১৮-১৯ সালে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির কাছে '১৮ জন ব্রাহ্মণ ও ১১ জন কায়স্থ' ভদ্রলোক অভিযোগ জানিয়ে পত্র দিয়েছিলেন, 'এতদ্দেশীয় পণ্ডিত কর্তৃক শুদ্ধিকরণ মুদ্রিত পুস্তকও প্রচলিত ছিল না যে তত্ত্বমুদ্রিত পুস্তক বর্ণানুসারে তাহারা শুদ্ধ লিখনাদিতে ক্ষমতাপন্ন হয়েন। পরে শ্রীযুক্ত ইংলণ্ডীয় লোকেরা মুদ্রিত পুস্তকের প্রচার করিলে ও এতদ্দেশীয়রা তৎপথ প্রজ্ঞ হইয়া কামসংবর্ধক নানবিধ রতিমঞ্জরী বিদ্যাসুন্দর নামশাস্ত্রে প্রচার করিয়া বালকদিগের মনশ্চাঞ্চল্য করিয়া কুপথ দৃষ্টি বৃদ্ধি করিয়ছিলেন।

কদাচারের বিরুদ্ধে অভিযান চালাবার মতো মানুষও উনিশ শতকের উষালগ্নে এগিয়ে এসেছিলেন। স্কুল বুক সোসাইটির তৃতীয় বর্ষের প্রতিবেদনে (১৯১৫-২০) বাংলা ভাষায় মুদ্রণ আরম্ভের পর ১৫ বছর দেশীয় উদ্যোগে মুদ্রিত বাংলা বইয়ের তালিকা দেওয়া হয়েছিল। এই তালিকায় রামমোহন রায়ের সতীদাহের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মধর্ম বিষয়ক ৯টি বই রয়েছে। সেই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য ৮টি আদিরস সংক্রান্ত বই এবং গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য মুদ্রিত 'অন্নদামঙ্গল' এবং বিশ্বনাথ দে মুদ্রিত 'বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান'। 'অন্নদামঙ্গল' ও 'বিদ্যাসুন্দর' উপাখ্যান সে যুগের বাজার মাত করা বই। বাকী ৮টি বই যেগুলি নিছক যৌন উদ্দীপক বিষয়ের অবতারণায় বাজারে ছাড়া হয়েছিল নতুন বিদ্যার আলোকপ্রাপ্ত 'বালকদিগের মনশ্চাঞ্চল্য করিয়া কুপথ দৃষ্টি' বাড়াতে সহায়ক হয়েছিল সেগুলি হল,—

১. রতিমঞ্জরী, ২. রসমঞ্জরী, ৩. আদিরস (শ্লোক), ৪. রসপদ্ধতি, ৫. শৃঙ্গার-তিলক, ৬. কামশাস্ত্র, ৭. রতিকলা, ৮. রতিবিলাস।

পনেরো বছরে বাংলা ভাষায় মিশনারীদের উদ্যোগ ছাড়া দেশীয় উদ্যোগে মুদ্রিত ১৯টি বইয়ের

মধ্যে ৮টি বই আদিরস সংক্রান্ত। সমাজে রুচিবিকৃতি কোন্ স্তরে রয়েছে এটি তারই প্রতিফলন। পড়ন্ত সামন্ততান্ত্রিক সমাজে রুচিবিকৃতি কতখানি ধারালো ছিল তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। তবে নোতুন যুগের উন্মেষ ঘটতে শুরু করেছে। সমাজ সংস্কারের চেষ্টার মধ্য দিয়ে উন্নত পরিশীলিত রুচির দেখা মেলে।

বিভ্রান্ত সমাজ রুচির বিরুদ্ধে রামমোহন রায় একা ছিলেন না। উল্লিখিত অজ্ঞাতনামা '১৮ জন ব্রাহ্মণ ও ১১ জন কায়স্থ' সন্তানের সাহসভরে এগিয়ে আসার সংবাদ যুগবদলের ইঙ্গিত বয়ে আনছে।